অপ্রচলিত রচনা

পরিচয়

উপেন্দ্রের সুকুমার রায়
ছেলে পেলে কামড়োবা
এমনি সে পাকালুম,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে মুকুরে
'এক্ষুনি আমার সঙ্গে
কী বিপত্তির মধ্যে তাহলে
আলাপ না হলে
মর মাগো আমরা?'
দিনে পরে উত্তর
রেগে বলে 'দূত্তোর
উড়ে ধর দাদুর'
কেঁদে বলি, 'জীবনে
কোনও এ বিপদে —
সংক্রম আমাদের
হেসে বলে পারদা
নিয়ে আয় তোমাদা
মুখোশ রামাদের

ক্ষুধা[১]

দুপুরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল ; আর ভঙ্গ হল কালো মিত্তিরের বহু সাধনালব্ধ ঘুম। বাইরে মোক্ষদা মাসির ক্ষুরধার কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তে সমস্ত বস্তিকে উচ্চকিত করে তুলল, কাউকে করল বিরক্ত আর কাউকে করল উৎকর্ণ ; তবু সবাই বুঝল একটা কিছু ঘটেছে। মাসির গর্জন শুনে নীলু ঘোষের পাঁচ বছরের ছেলে তিনু কান্না জুড়ে দিল, আর তার মা যশোদা তাকে চুপ করাবার জন্যে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং সন্তর্পণে কান পেতে রইল মাসির স্বর-সন্ধানের প্রতি। সকলের মধ্যেই একাগ্র হয়ে রইল আগ্রহ ও উত্তেজনা, কিন্তু কেউ ব্যস্ত নয়। কোনো প্রশ্নই কেউ করল না। করতে হয়ও না। কারণ সবাই জানে মাসি একাই একশো—এবং এই একশো জনের প্রচার-বিভাগ আজ পর্যন্ত কারো প্রশ্নের প্রত্যাশা বা অপেক্ষা করে নি। মাসি এক নিঃশ্বাসে এক ঘটি জল নিঃশেষ ক'রে শুরু করল :

—ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো কণ্টোরালির মুখে। মরণ হয় না রে তোদের ? পয়সা দিয়ে চাল নেব, অত কথা শুনতে হবে কেন শুনি ? আমরা কি তোদের খাসতালুকের পেরজা ? আগুন লেগে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে চালের গুদোম রে। দু'মুঠো চালের জন্যে আমার মানসম্ভোম সব গেল গো! আবার টিকিট ক'রেছেন, টিকিট ; বলি ও টিকিটের কী দাম আছে শুনি ?—লক্ষ্মী পিসিকে সম্মুখবর্তী দেখে মাসির স্বর সপ্তমে উঠল :—ও টিকিটে কিচ্ছু হবে না গো, কিচ্ছু হবে না। সোমত্ত বয়েস, সুন্দর মুখ না হলে কি চাল পাবার যো আছে ? আমি হেন মানুষ ভোর থেকে বসে আছি টিকিট আঁকড়ে তিন প'র বেলা পর্যন্ত, আর আমাকে চাল না দিয়ে চাল দিলে কিনা ও বাড়ির মায়া সুন্দরীকে! কেন ? তোর সাথে কি মায়ার পিরীত চলছে নাকি ? (তারপর একটা অশ্লীল মন্তব্য)।...

বিনয় এতক্ষণ মাসির বাক্যঝড়কে একরকম উপেক্ষা করেই লিখে

চলছিল, কিন্তু মায়ার নাম এবং সেই সঙ্গে ওর প্রতি একটা ইতর উক্তি শুনে তার কলম তার অজ্ঞাতসারেই শ্লথ এবং মন্থর হয়ে এল। সে একটু আশ্চর্য হল। সে-আশ্চর্যবোধ মাসির চাল না পাওয়ার জন্যে নয়; বরং এতে সবচেয়ে আশ্চর্য না হওয়ারই কথা, কারণ এ একটা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সে আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মায়া কিনা শেষ পর্যন্ত চাল আনতে গেছল!

বিনয় হয়তো ভাবতে পারল চাল না পাওয়া একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু মাসির কাছে এ একেবারে নতুন ও অপ্রত্যাশিত; কারণ এতদিন পর্যন্ত সে নির্বিবাদে ও নিরঙ্কুশ ভাবে চাল পেয়ে এসেছে এবং আজই তার প্রথম ব্যতিক্রম বলেই সে এতটা মর্মাহত। অন্যান্য দিন যারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে মাসির কাছে দুঃখ জানিয়েছে, মুখে তাদের কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেও মনে মনে মাসি এদের অকৃতকার্যতায় হেসেছে; কিন্তু আজ মাসি ব্যর্থতার দুঃখ অনুভব করলেও যারা তারই মতো ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তার সহানুভূতি দূরে থাক উপরন্তু রাগ দেখা দিল। তাই লক্ষ্মী পিসির উদ্দেশ্যে সে বলল:

—তুই চাল পেলি না কেন রে পোড়ারমুখী?

লক্ষ্মী পিসি মাসির চেয়ে বয়সে ছোট এবং তার প্রতাপে জড়োসড়োও বটে, তাই সে জবাব দিল: কী করব, বল?

মাসি দাঁত খিঁচিয়ে উঠল এবং তারপর কণ্ট্রোলের শাপান্ত এবং বাপান্ত করতে করতে দুপুরটা নষ্ট করতে উদ্যত দেখে বিনয় ঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। বিনয় এ. আর. পি. সুতরাং সকলের অবজ্ঞেয় এবং গভর্ণমেণ্টের পোষ্য জীব বলে উপহসিত। প্রধানত সেই কারণে, আর তা ছাড়া বিনয়ের রহস্যজনক চলাফেরায় সকলে বিনয়কে এড়িয়ে চলে এবং বিনয় সকলকে এড়িয়ে যায়। কাজেই বিনয়কে বেরোতে দেখে সমবেত নারীমণ্ডলী অর্থাৎ মোক্ষদা, লক্ষ্মী, যশোদা, আশার মা, পুঁটি, রেণু, হারু ঘোষ এবং ননী দত্তের স্ত্রী

প্রভৃতি চঞ্চল হয়ে ঘোমটা টেনে স'রে গেল। তারপর আবার যথারীতি ক্ষুধিত, বঞ্চিত এবং উৎপীড়িত নারীদের সভা চলতে লাগল।

কেউ কণ্ট্রোলের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে, কেউ সিভিকগার্ডের অত্যাচারের সম্বন্ধে, কেউ গভর্ণমেণ্টের অবিচার সম্বন্ধে উঁচু-নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। মাসি এ-সভার প্রধান বক্তা, যেহেতু সে সদ্যব্যর্থ এবং সর্বাপেক্ষা আহত, সর্বোপরি তার কণ্ঠস্বরই বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত। ক্রমে আলোচনা কণ্ট্রোল থেকে মায়া-বিনয়ের সম্পর্ক এবং তা থেকে ক্রমশ চুরি-ডাকাতির উপদ্রবে পর্যবসিত হল দেখে যশোদা তার কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে ঘরে ঢুকল, আর তার পেছনে পেছনে তিনু 'মা খেতে দিবি না?' 'কখন ভাত রাঁধবি?' ইত্যাদি বলতে বলতে যশোদার আঁচল ধরে টানতে থাকল আর তার ছোট ছোট মুঠির অজস্র আঘাতে মাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো; নীলু ঘোষ আজও কণ্ট্রোল থেকে চাল পায় নি, তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘরে ফিরেছিল, কিন্তু তিনুর অবিরাম কান্না তাকে বাধ্য করল আর কোথাও চাল পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করে দেখতে। তাই সে গামছা হাতে বেরিয়ে পড়ল দূরের কোনো কণ্ট্রোল্ড দোকানের উদ্দেশ্যে। আর ঘরের মধ্যে যশোদা ক্ষুধার্ত সন্তানের হাতে নিপীড়িত হতে লাগল। যশোদা এবং নীলু আজ দু'দিন উপবাসী। নীলু ঘোষ একটা প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করত, মাইনে ছিল পনেরো টাকা। যদিও একমণ চালের দাম কুড়ি টাকা, তবুও নীলু ঘোষ কণ্ট্রোল্ড দোকানের উপর নির্ভর করে চালাতে পারত, যদি চালের প্রত্যাশায় কণ্ট্রোল্ড দোকানে ধর্ণা দিয়ে পর পর কয়েক দিন দেরি ক'রে তার চাকরীটা না যেত। আজ মাসখানেক হল নীলু ঘোষের চাকরী নেই, কিন্তু এতদিন যে সে না-খেয়ে আছে এমন নয়, তবে সম্প্রতি আর চলছে না, আর সেইজন্যেই সে এবং যশোদা দু'দিন ধরে অনশনে কাটাচ্ছে। যশোদার যা কিছু গোপন সম্বল ছিল তাই দিয়ে

গত দু'দিন সে তিনুর ক্ষুধাকে শান্ত করেছে আর কোলের ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বুকের পানীয় দিয়ে। কিন্তু আজ? আজ তার সম্বল ফুরিয়েছে, বক্ষস্থিত পানীয় নিঃশেষিত; আর নিজে সে তীব্র বুভুক্ষায় শীর্ণ এবং দুর্বল। অনশন ক'রে সে নিজের প্রতিই যে শুধু অবিচার করেছে, তা নয়, অবিচার করেছে আর একজনের প্রতি— সে আছে তার দেহে, সে পুষ্ট হচ্ছে তার রক্তে, সে প্রতীক্ষা করছে এই আলো-বাতাসময় পৃথিবীর মুক্তির। তার প্রতি যশোদার দায়িত্ব কি পালিত হল? ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় সে চোখ বুঁজলো, কোলের শিশুটাকে নিবিড় করে চেপে ধরল আতঙ্কিত বুকে। যশোদা ভেবে পায় না কী প্রয়োজন এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে ভীত পৃথিবীতে একটি নতুন শিশুর জন্ম নেবার? অথচ তার আত্মপ্রকাশের দিন নিকটবর্তী।

হারু ঘোষ নীলুর অগ্রজ এবং সে এই বাড়িতেই পৃথক ভাবে থাকে, চাকরী করে চটকলে, মাইনে পঁচিশ টাকা। নীলুর কাছে সে অবস্থাপন্ন, তাই নীলু তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং সম্বোধন করে 'বড়লোক' বলে। দিন সাতেক আগে তিনুর কাছে ঠিক এই রকম উৎপীড়িত হয়ে যশোদা তার সঙ্গতি থেকে একসের চাল কেনবার মতো পয়সা নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিল কন্ট্রোল্ড দোকানের দিকে। এই প্রথম সে একাকী পথে বেরুল। লজ্জায়, সংকোচে, অনভ্যাসের জড়তায় শোচনীয় হয়ে উঠল তার অবস্থা। সে আরো সংকটাপন্ন হল যখন কোলের শিশুটা রাস্তার মাঝখানে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। তবু সে ঘোমটার অন্তরালে আত্মরক্ষা করতে করতে কন্ট্রোল্ড দোকানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখল সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দু'জন নয়, শত-শত এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, আব্রু নেই, সংযম নেই, নেই কোন কিছুই; শুধু আছে ক্ষুধা আর আছে সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহার্য চায়, তারো বাঁচবার অদম্য

লিপ্সা। সবকিছু দেখেশুনে যশোদা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চেষ্টা করছিল শিশুটাকে শান্ত করবার আর ডাকছিল সেই ভগবানকে যে-ভগবান অন্তত একসের চাল তাকে দিতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে ভগবানের বদলে উপস্থিত হল হারু ঘোষ। সে কারখানায় ধর্মঘট ক'রে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময় পথের মধ্যে ভ্রাতৃবধূকে ঐ অবস্থায় দেখে কেমন যেন বেদনা বোধ করল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যশোদার কাছে গিয়ে ডাকল: বৌমা, এসো। ঠিক এই রকম দুরবস্থার মধ্যে সহসা ভাশুরের হাতে ধরা পড়ে যশোদার অবস্থা হল অবর্ণনীয়। তার ইচ্ছা হল সীতার মতো ভূগর্ভে মিলিয়ে যেতে অথবা সতীর মতো দেহত্যাগ করতে। কিন্তু তা যখন হল না তখন বাধ্য হয়ে ফিরতে হল হারু ঘোষের পেছনে পেছনে।

ঘরে ফিরে হারু ঘোষ স্ত্রীর কাছ থেকে একসের চাল নিয়ে যশোদাকে দিল। বলল: নীলুকে বলো, পুরুষ মানুষ হয়ে যে বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে চাকরী অথবা চাল কোনটাই যোগাড় করতে না পেরে নীলু ঘোষ নিরাশ এবং সন্ত্রস্ত মনে বাড়ি ফিরল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—পথে পথে নিরন্ধ্র অন্ধকার। স্যাঁৎসেঁতে গলিটার মধ্যে প্রবেশ করতেই মূর্তিময় আতঙ্ক যেন তাকে ঠাণ্ডা হাত দিয়ে স্পর্শ করল। নীলু ঘোষ এক মুহূর্ত থামল, কী যেন ভাবল, তারপর নিঃশব্দে অগ্রসর হল। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সে যা দেখল তাতে সে অবাক হল না, এবং এটাই সে আশা করেছিল। যশোদা তিনুকে ভাত খাওয়াচ্ছে। নীলু নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করল। ভাগ্যিস্ সে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছিল, তাই এমন গোপন ব্যাপারটা সে জানতে পারল। তা হলে এই ব্যাপার? এরা জমানো চাল লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে, আর সে কিনা সারাদিন না খেয়ে ঘুরছে? সে আড়াল থেকে অনেকক্ষণ লণ্ঠনের আলোয় যশোদার ভালমানুষের মতো মুখখানা দেখল, আর রাগে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ইচ্ছা হল

ছুটে গিয়ে একটি লাথিতে তাকে ধরাশায়ী করতে। কিন্তু সে-জিঘাংসা অতি কষ্টে সে দমন করল ; কারণ সে জানে, তারই একজন অদৃশ্য সন্তান যশোদার দেহকে আশ্রয় করে আছে।

নীলু ঘরে ঢুকল। নীলুকে দেখে যশোদা তিনুকে আঁচিয়ে নীলুর জন্যে জায়গা করে ভাত বাড়তে বসল। যশোদাকে ধরা পড়ে এই ভালমানুষী করতে দেখে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও নীলুর হাসি পেল। কিন্তু তবুও সে খেতে বসল, কারণ খাওয়া তার দরকার। ভাতে হাত দিয়েই সে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল : এ-চাল ছিল কোথায় ?

যশোদা সংক্ষেপে উত্তর দিল : আজকে বিকেলে তোমার দাদা দিয়েছেন।

মুহূর্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল নীলুর মধ্যে। কিছুক্ষণ যশোদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল : দিয়ে কী বললে ? কতদিনের জন্যে চালটা ধার দিল সে-সম্বন্ধে কিছু বলেছে কী ?

অতর্কিতে যশোদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল : না, সে সম্বন্ধে কিছু বলে নি। শুধু বলেছে, যে-পুরুষমানুষ বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারে না তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

যে-কথাটা যশোদা এতক্ষণ ধরে বলবে না বলে ভেবে রেখেছিল সেই কথাটা অসাবধানে বলে ফেলেই সে বিপুল আশঙ্কায় নীলুর মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু হুংকার দিয়ে উঠল :

—কী, আমাকে যে এতবড় অপমান করল তার দেওয়া চাল তুই আমাকে খাওয়াতে বসেছিস, হতভাগী ? কে বলেছিল তোকে ঐ বড়লোকের দেওয়া চাল আনতে, এ্যাঁ ? তুই আমার বৌ হয়ে কিনা ওর কাছে ভিক্ষে করতে গেছিলি ? হারামজাদী, খা, তোর ভিক্ষে করে আনা চাল তুই খা—

বলেই ভাতের থালাটা পদাঘাতে দূরে সরিয়ে নীলু ঘোষ হাত ধুয়ে ঘরে এসে যশোদাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চললো :

—বেরো পোড়ারমুখী, বেরো আমার ঘর থেকে, তোকে পাশে ঠাঁই দিতেও আমার ঘেন্না করে। যা, তোর পেয়ারের লোকের কাছে শুগে যা—তোর মুখ দেখতে চাই না।

নীলু যশোদাকে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আর যশোদা অত্যন্ত সাবধানে এবং নীরবে এইটুকু সহ্য করল। বারান্দায় ভিজে মাটির ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যশোদার চোখ জলে ভরে এল, ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। আর হারু ঘোষ ঘরে শুয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল; কারণ অপরাধ তো তারই, সেই তো ওদের কষ্টে ব্যথিত হয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাল।

তার পরদিনই কোথা থেকে যেন নীলু পাঁচ সের চাল নিয়ে এল। সেই চালে ক'দিন চলার পর দু'দিন হল ফুরিয়ে গেছে, তাই দু'দিন ধরে যশোদা অনাহারে আছে। এ ক'দিন সবই হয়েছে, কেবল নীলু এবং যশোদার মধ্যে কোনো কথোপকথন হয় নি। শুধু নীলু মাঝে মাঝে চুপি চুপি তিনুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে: হ্যাঁ রে খোকা, তোর মা ভাত খেয়েছে তো রে? অজ্ঞ তিনু খুশিমত কখনো 'হ্যাঁ' বলেছে, কখনো 'না' বলেছে।

কাল নীলু পরিমিত পয়সা নিয়ে গিয়েও কন্ট্রোল্ড দোকান থেকে বেলা হয়ে যাওয়ার জন্যে চাল না নিয়ে ফিরে এসেছিল। নীলুর ওপর যশোদার এজন্যে রাগই হয়েছিল, কিন্তু আজ মোক্ষদা মাসির কাছ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে তিনুর অজস্র মুষ্টিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করে সে ভাবতে লাগল, দোষ নীলুর নয়, তার ভাগ্যের নয়, দোষ মুষ্টিমেয় লোকের, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে অথচ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে না তাদের।

এদিকে হারু ঘোষের মিলের কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী না মানায় হারুর জীবনযাত্রাও কষ্টকর হয়েছে। তার চাল ফুরিয়ে গেছে

চার পাঁচ দিন হল। রোজ এর-ওর কাছ থেকে ধার করে চলছে, তাকেও কণ্ট্রোল্ড দোকানের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আজ প্রভাত হবার আগে হারু এবং নীলু উভয়েই বেরিয়ে পড়েছিল, উভয়ের ঘরেই চাল নেই। উভয়েই তাই কণ্ট্রোল্ড দোকানের লাইনের প্রথমে দাঁড়াবার জন্যে গিয়ে দেখে, তারা প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। তার আগেই বহু লোক সমবেত।

কাল পর্যন্ত যা ছিল সম্বল তাই দিয়েই যশোদা তিনুকে ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আজ যখন ক্ষুধার জ্বালায় তিনু মাকে মারা ছেড়ে দিয়ে মাটি খেতে শুরু করল তখন আর সহ্য হল না যশোদার। তিনুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল হারু ঘোষের স্ত্রীর কাছে, গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল :

—দিদি আমার ছেলেকে বাঁচাও, দু'মুঠো চাল দিয়ে রক্ষা কর একে, তোমার তো ছেলেমেয়ে নেই, তুমি তো ইচ্ছা করলে আর একবেলা না খেয়ে থাকতে পার, কিন্তু এর শিশুর প্রাণ আর সইতে পারছে না দিদি! দিদি, এর মুখের দিকে একবার তাকাও। তোমার শ্বশুরকুলের প্রদীপটিকে নিভতে দিও না।

বলেই যশোদা তার দিদির পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তিনুও তার মা'র কাণ্ড দেখে কান্না ভুলে গেল। যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করার পরও দিদির নারী সুলভ হৃদয় উদ্বৃত্ত তণ্ডুলাংশটুকু না দিয়ে পারল না।

সেইদিন রাত্রে। সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটি করেও ভ্রাতৃদ্বয় চাল অথবা পয়সা কিছুই যোগাড় করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে ঢুকে নীলু ঘোষ সব চুপচাপ দেখে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছিল, এমন সময় হারু ঘোষের প্রবেশ। বাড়িতে পদার্পণ করেই এই ঘটনা শুনে ক্ষুধিত হারু ঘোষ স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় জ্বলে উঠল :

—কে বলেছিল ওদের দয়া করতে? ওদের ছেলে মারা গেলে আমাদের কী? নিজেরাই খেতে পায় না, তায় আবার দান-খয়রাত, ওদের চাল দেওয়ার চেয়ে বেড়াল-কুকুরকে চাল দেওয়া ঢের ভাল,

ওই বেইমান নেমক-হারামের বৌকে আবার চাল দেওয়া! ও আমার ভাই! ভাই না শত্তুর! চাল কি সস্তা হয়েছে, না, বেশী হয়েছে যে তুমি আমায় না বলে চাল দাও!

সঙ্গে সঙ্গে হারু ঘোষের স্ফুলিঙ্গ নীলু ঘোষের বারুদে সঞ্চারিত হল। মুখের বিড়িটা ফেলে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল নীলু ঘোষ। চকিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে উঠল—কী, আবার? বড্ড খিদে তোর, না? দাঁড়া তোর খিদে ঘুচিয়ে দিচ্ছি…বলেই প্রচণ্ড এক লাথি। বিকট আর্তনাদ করে যশোদা লুটিয়ে পড়ল নীলু ঘোষের পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল হারু ঘোষ, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, হারুর স্ত্রী, আশার মা, পুঁটি, রেণু, কালো মিত্তির, বিনয়, মায়া ইত্যাদি সকলে। ডাক্তার, আলো, পাখা, জল, এ্যাম্বুলেন্স, টেলিফোন প্রভৃতি, লোকজন শব্দকোলাহল নীলুকে কেমন যেন আচ্ছন্ন এবং বিমূঢ় করে ফেলল। সে স্তব্ধ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। যশোদাকে কখন যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল নীলুর অচৈতন্য মনের পটভূমিতে তার চিহ্ন রইল না। ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর নীলুর মন কেমন যেন শূন্যতায় ভরে গেল, আস্তে আস্তে মনে পড়ল একটু আগের ঘটনা। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল যশোদার পরিত্যক্ত জীর্ণ বিছানায়, যশোদার চুলের গন্ধময় বালিশটাকে আঁকড়ে ধরল সজোরে। সব চুপচাপ। শুধু তার হৃৎপিণ্ডের দ্রুততালে ধ্বনিত হতে থাকল বুভুক্ষার ছন্দ আর আসন্ন মৃত্যুর দ্রুততর পদধ্বনি। সমস্ত আশা এবং সমস্ত অবলম্বন আজ দারিদ্র্য ও অনশনের বলিষ্ঠ দুই পায়ে দলিত, নিঃশেষিত। …সুতরাং? অন্ধকারে নীলু ঘোষের দু'চোখ একবার শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠে নিভে গেল; আকাশে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন—প্রহরী বিমানের নৈশ পরিক্রমা।

আর হারু ঘোষ? শ্রান্ত, অবসন্ন হারু ঘোষের মনেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। ক্ষুধিত হারু ঘোষ অন্ধকারে নিশাচরের মতো নিঃশব্দ পদচারণায় সারা উঠোনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেওয়ালে

নিজের ছায়া দেখে থম্‌কে দাঁড়ায়- তারপর আবার ঘুরতে থাকে। একে একে প্রত্যেক ঘরের আলো নিভে যায়, অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে, রাত গভীরতর হয়, তবু হারু ঘোষের পদচারণার বিরাম নেই। অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে হারু ঘোষ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে অনুভব করতে থাকে কিসের যেন অশরীরী আবির্ভাব। অত্যন্ত ভীত, অত্যন্ত অসহায় ভাবে তাকায় আকাশের দিকে, সেখানে লক্ষ লক্ষ চোখে আকাশ ভর্ৎসনা জানায়—ক্ষমা নেই। হারু ঘোষ উন্মাদ হয়ে উঠল—আকাশ বলে ক্ষমা নেই, দেওয়ালের ছায়া বলে ক্ষমা নেই, তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুতস্বরে ঘোষণা করতে থাকে ক্ষমা নেই। তার কানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বরে ধ্বনিত হতে থাকে—ক্ষমা নেই।...

ভোরের দিকে মোক্ষদা মাসি ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে ফিস ফিস করে হারু ঘোষ জিজ্ঞাসা করল—কী খবর?

মোক্ষদা মাসির মতো মুখরাও মূক, মুহ্যমান—দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে জানালে, বেঁচে নেই। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল তার ঘরের দিকে।

হারু ঘোষের সারা দেহে চাবুকের মতো চমকে উঠল আর্তনাদ; শরীর-মন এক সঙ্গে টলে উঠল, সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে বয়ে গেল অগ্নিময় প্লাবন। রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। পাণ্ডুর আকাশের দিকে তাকিয়ে হারু ঘোষ নিজেও এবার অনুভব করল: ক্ষমা নেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বিনয় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে, মায়া অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে ডাকছে। বেশ বেলা যে হয়ে গেছে

চারিদিকের তীব্র রোদ্দুর তারই বিজ্ঞাপন। কালকের দুর্ঘটনার জন্যে তার ঘুম আসতে বেশ দেরী হয়েছিল, সুতরাং বেলায় যে ঘুম ভাঙবে এটা জানা কথা, কিন্তু সেজন্যে মায়ার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই; তবু একটা 'কারণ' মনে মনে সন্দেহ করে বিনয় পুলকিত হল। মৃদু হেসে বলল: দাঁড়াও, উঠছি—তুমি যে একেবারে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে এসেছ দেখছি।

—উঃ, কী কুঁড়ে আপনি, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি, এদিকে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে তা তো জানেন না—

বিনয় কৃত্রিম গাম্ভীর্য ও বিস্ময়ের ভান করে বলল: বটে? কী রকম?

মায়া এক নিঃশ্বাসে বলে গেল: যশোদা কাকীমা কাল রাত্তিরে হাসপাতালে মারা গেছে, আর আজ সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে, হারু কাকা, নীলু কাকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

প্রচণ্ড বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-তাড়নায় বিনয় এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল: এ্যাঁ, বল কি?

তারপর দ্রুত হাতে এ. আর. পি.-র নীল কোর্তাটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অগণিত কৌতূহলী জনতা উঠোন-বারান্দা ভরিয়ে তুলেছে। পুলিশ, জমাদার, ইন্সপেক্টরের অপ্রতিহত প্রতাপ। তারই মধ্যে দিয়ে বিনয় চেয়ে দেখল, হারু ঘোষ বারান্দায় আর নীলু ঘোষ ঘরে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে চিরকালের মতো ব্যঙ্গ করে বীভৎসভাবে ঝুলছে, যেন জিভ ভেঙচাচ্ছে আসন্ন দুর্ভিক্ষকে।

বিপুল জনতা আর ঐ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে বিনয় বস্তি ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আপন মনে পথ চলতে শুরু করল, ভাবতে লাগল: দুর্ভিক্ষ যে লেগেছে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত কি এই নয়? আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের লাভার মতোই তলে তলে উত্তপ্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষ, প্রতীক্ষা করছে বিপুল বিস্ফোরণের; সেই অনিবার্য অগ্নুৎপাতের সূচনা দেখা গেল কাল রাত্রে। অথচ প্রত্যেকে

গোপন করে চলেছে সেই অগ্নি-উদ্গীরণের প্রকম্পনকে আর তার সম্ভাবনাকে। আস্তে আস্তে ধ্বসে যাচ্ছে জীবনের ভিত্তি, ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে ক্ষুধার নগ্নরূপ। তবু অদ্ভুত ধৈর্য মানুষের; সমাজকে সভ্যতাকে বাঁচাবার চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

বিনয় এক সময়ে এসে দাঁড়াল পাড়ার কণ্ট্রোল্ড দোকানের সামনে। অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল তার; দেখল, মোক্ষদা মাসি, লক্ষ্মী পিসি, মায়া সবাই সেখানে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। বিনয় বিস্মিত হল। আর একটু আগে মোক্ষদা মাসিকে সে শোক করতে দেখে এসেছিল, অথচ নিয়তির মতো ক্ষুধা সুযোগ পর্যন্ত দিল না পরিপূর্ণ শোক করবার। মায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। অদ্ভুত ক্ষুধার মাহাত্ম্য! বিনয় ভাবতে থাকল: ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে না পৃথিবীর যে-কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর।

লাইনবন্দী প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করছে চালের জন্যে। বিনয় ভাবল, এ-প্রতীক্ষা চালের জন্যে, না বিপ্লবের জন্যে? বিনয় স্পষ্ট অনুভব করল এরা বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করছে, অনিবার্য করে তুলছে প্রতিদিনকার ধৈর্যের মধ্যে দিয়ে। আর এদের অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা করছে তারই পূর্ণ আয়োজন। এরা একত্র, অথচ এক নয়; এরা প্রতীক্ষমান, তবু সচেষ্ট নয়, এরা চাইছে এতটুকু চেতনার আগুন··· এদের মধ্যে আত্মগোপনকারী, ছদ্মবেশী ক্রমবর্ধমান ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করে বিনয় এদের সংহত, সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করে সেই আগুন জ্বালার প্রতিজ্ঞা নিল।

□

দুর্বোধ্য[২]

সহর ছাড়িয়ে যে-রাস্তাটা রেল-স্টেশনের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার উপরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় লোকটিকে প্রতিদিন একভাবে দেখা যায়—যেমন দেখা যেতো পাঁচ বছর আগেও। কোনো বিপর্যয়ই লোকটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি—যতদূর জানা যায়। এই স্থাণু বৃদ্ধ লোকটি অন্ধ, ভিক্ষাবৃত্তি তার একমাত্র জীবিকা। তার সামনে মেলা থাকে একটা কাপড়, যে কাপড়ে কিছু না কিছু মিলতই এতকাল—যদিও এখন কিছু মেলে না। লোকটি অন্ধ, সুতরাং যে তাকে এই জায়গাটা বেছে দিয়েছিল তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়, যেহেতু এখানে জন-সমাগম হয় খুব বেশী এবং তা রেল-স্টেশনের জন্যেই। সমস্ত দিনরাত এখানে লোক-চলাচলের বিরাম নেই, আর বিরাম নেই লোকের কথা বলার। এই কথাবলা যেন জনস্রোতের বিপুল কল্লোলধ্বনি, আর সেই ধ্বনি এসে আছড়ে পড়ে অন্ধের কানের পর্দায়। লোকটি উন্মুখ হয়ে থাকে—কিছু মিলুক আর নাই মিলুক, এই কথাশোনাই তার লাভ। নিস্তব্ধতা তার কাছে ক্ষুধার চেয়েও যন্ত্রণাময়।

লোকটি সারাদিন চুপ করে বসে থাকে মূর্তিমান ধৈর্যের মতো। চিৎকার করে না, অনুযোগ করে না, উৎপীড়িত করে না কাউকে। প্রথম প্রথম, সেই বহুদিন আগে, লোকে তার নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কিছু দিত। সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ যখন তার কাছে সূর্যের তাপ আর লোকজনের কথাবার্তার অস্তিত্ব থাকত না, তখন সে বিপুল কৌতূহল আর আবেগের সঙ্গে কাপড় হাতড়ে অনুভব করত চাল, পয়সা, তরকারী···। তৃপ্তিতে তার অন্ধ দু'চোখ অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠত। তারপরে সেই অন্ধকারেই একটা নরম হাত এসে তার শীর্ণ হাতটাকে চেপে ধরত—যে-হাত আনতো অনেক আশ্বাস আর অনেক রোমাঞ্চ। বৃদ্ধ তার উপার্জন গুছিয়ে নিয়ে সেই নরম হাতে

আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। তারপর ভোর হবার আগেই সেই হাতেই ভর করে গাছের তলায় এসে বসত। এমনি করে কেটেছে পাঁচ বছর।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ এল অবশেষে। লোকের আলাপ-আলোচনা আর তার মেলে-ধরা কাপড়ের শূন্যতা বৃদ্ধকে সে-খবর পৌঁছে দিল যথা সময়ে।

—কুড়ি টাকা মণ দরেও যদি কেউ আমাকে চাল দেয় তো আমি এক্ষুণি নগদ কিনতে রাজি আছি পাঁচ মণ—বুঝলে হে—

উত্তরে আর একটি লোক কি বলে তা শোনা যায় না, কারণ তারা এগিয়ে যায় অনেক দূর···

—আরে ভাবতিছ কী ভজহরি, এবার আর বৌ-বেটা নিয়ে বাঁচতি অবে না—

—তা যা বলিছ নীলমণি···

বৃদ্ধ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না। শুধু একটা প্রশ্ন তার মন জুড়ে ছটফট করতে থাকে—কেন, কেন? বৃদ্ধের ইচ্ছা করে একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে—কেন চালের মণ তিরিশ টাকা, কেন যাবে না বাঁচা—কিন্তু তার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এই অন্ধ বৃদ্ধকে বোঝাবে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি? শুধু বৃদ্ধের মনকে ঘিরে নেমে আসে আশংকার কালো ছায়া। আর দুর্দিনের দুর্বোধ্যতায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে দিনের পর দিন। অজন্মা নয়···প্লাবন নয়···তবু দুর্দিন, তবু দুর্ভিক্ষ? শিশুর মতো সে অবুঝ হয়ে ওঠে; জানতে চায় না—কেন দুর্দিন, কেন দুর্ভিক্ষ—শুধু সে চায় ক্ষুধার আহার্য। কিন্তু দিনের শেষে যখন কাপড় হাতড়ে সে শুক্‌নো গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই পায় না, তখন সারাদিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে তার আহত অবরুদ্ধ মন বিপুল বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-শক্তি কোথায়? খানিক পরে সেই নরম হাতে তার অবসন্ন শিথিল

হাত নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তুলে দেয়। আর ক্রমশ অন্ধকার তাদের গ্রাস করে।

একদিন বৃদ্ধের কানে এল: ফেণীতে যে আবার বোমা পড়ছে, ত্রিলোচন—

উত্তরে আর একটি লোকের গলা শোনা যায়: বল কী হে, ভাবনার কথা—

দ্বিতীয় ব্যক্তির দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও অন্ধ বৃদ্ধের মনে কোনো চাঞ্চল্য দেখা দিল না। তার কারণ সে নির্ভীক নয়, সে অজ্ঞ। কিন্তু সে যখন শুনল:

—ঘনশ্যামের বৌ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মরেছে, সে-খবর শুনেছ শচীকান্ত?

তখন শচীকান্তের চেয়ে বিস্মিত হল সে। শূন্য কাপড় হাতড়ে হাতড়ে দুর্দিনকে মর্মে মর্মে অনুভব করে বৃদ্ধ, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে অনেক বেশী ক্লান্ত করে তোলে; প্রতিদিন।

তারপর একদিন দেখা গেল বৃদ্ধ তার নীরবতা ভঙ্গ করে ক্ষীণ-কাতর স্বরে চিৎকার করে ভিক্ষা চাইছে আর সেই চিৎকার আসছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে: সেই চিৎকারে বিরক্ত হয়ে কেউ কিছু দিল, আর কেউ বলে গেল:

—নিজেরাই খেতে পাই না, ভিক্ষে দেব কী করে?

একজন বলল: আমরা পয়সা দিয়ে চাল পাই না, আর তুমি বিনি পয়সায় চাল চাইছ? বেশ জোচ্চুরি ব্যবসা জুড়েছ, বাবা!

আবার কেউ বলে গেল: চাইছ একটা পয়সা, কিন্তু মনে মনে জানো এক পয়সা মিলবে না, কাজেই ডবল পয়সা দেবে, বেশ চালাক যা হোক!

এইসব কথা শুনতে শুনতে সেদিন কিছু পয়সা পাওয়া গেল এবং অনেকদিন পর এই রোজগার তার মনে ভরসা আর আনন্দ এনে দিল। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষার পরও সেইদিন আর সেই

কোমল হাত তার হাতে ধরা দিল না। দুর্ভাবনায় আর উৎকণ্ঠায় বহু সময় কাটার পর অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে চমকে উঠে সে হাতড়াতে লাগল, আর খুঁজতে লাগল একটা কোমল নির্ভরযোগ্য হাত। আস্তে আস্তে একটা আতঙ্ক দেখা দিল—অপরিসীম বেদনা ছড়িয়ে পড়ল তার মনের ফসলকাটা মাঠে। বহুদিন পরে দেখা দিল তার অন্ধতাজনিত অক্ষমতার জন্যে অনুশোচনা। রোরুদ্যমান মনে কেবল একটা প্রশ্ন থেকে থেকে জ্বলে উঠতে লাগল: পাঁচ বছর আগে যে এইখানে এনে বসিয়েছে পাঁচ বছর পরে এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে সে এখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না?—তার অনেক প্রশ্নের মতোই এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। শুধু থেকে থেকে ক্ষুধার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তোলে।

তারপর আরো দুদিন কেটে গেল। চিৎকার করে ভিক্ষা চাইবার ক্ষমতা আর নেই, তাই সেই পয়সাগুলো আঁকরে ধ'রে সে ধুঁকতে থাকল। আর দু-চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা জল। দু-হাতে পেট চেপে ধ'রে তার সেই গোঙানী, কারো কানে পৌঁছুলো না। কারণ কারুর কাছেই এ দৃশ্য নতুন নয়। আর ভিখারীকে করুণা করাও তাদের কাছে অসম্ভব। যেহেতু দুর্ভিক্ষ কত গভীর, আর কত ব্যাপক!

বিকেলের দিকে যখন সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে, তখন একটা মিলিত আওয়াজ তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল; ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হল। তার অতি কাছে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল: অন্ন চাই—বস্ত্র চাই…। হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর উন্মত্ত আওয়াজ তার অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনল—অদ্ভুত উন্মাদনায় সে কেঁপে উঠল থর্‌থর্ করে। লোকের কথাবার্তায় বুঝল: তারা চলেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে চাল আনতে। অন্ধ বিস্মিত হল—তারই প্রাণের কথা হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

তারই নিঃশব্দ চিৎকার এদের চিৎকারে মূর্ত হচ্ছে! তা হলে এত লোক, প্রত্যেকেই তার মতো ক্ষুধার্ত, উপবাসখিন্ন? একটা অজ্ঞাত আবেগ তার সারাদেহে বিদ্যুতের মতো চলাফেরা করতে লাগল, সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। এত লোক, প্রত্যেকের ক্ষুধার যন্ত্রণা সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগল, তাই অবশেষে সে বিপুল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে পারল না, কেবল একবার মাত্র তাদের সঙ্গে "অন্ন-চাই" বলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই রাত্রে একটা নরম হাত বৃদ্ধের শীতল হাতকে চেপে ধরল; আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে তার কোঁচড়ে ভরা চাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

□

ভদ্রলোক[৩]

"শিয়ালদা—জোড়া-মন্দির—শিয়ালদা" তীব্র কণ্ঠে বার কয়েক চিৎকার করেই সুরেন ঘন্টি দিল 'ঠন্ ঠন্' করে। বাইরে এবং ভেতরে, ঝুলন্ত এবং অনন্ত যাত্রী নিয়ে বাসখানা সুরেনের 'যা-ওঃ, ঠিক হ্যায়' চিৎকার শুনেই অনিচ্ছুক ও অসুস্থা নারীর মতো গোঙাতে গোঙাতে অগ্রসর হল। একটানা অস্বস্তিকর আওয়াজ ছড়াতে লাগল উ-উ-উ-উ-উ-উ-উ।

"টিকিট, বাবু, টিকিট আপনাদের"—অপরূপ কৌশলের সঙ্গে সেই নিশ্ছিদ্র ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সুরেন প্রত্যেকের পয়সা আদায় করে বেড়াতে লাগল। আগে ভিড় তার পছন্দ হ'ত না, পছন্দ হ'ত না অনর্থক খিটির-মিটির আর গালাগালি। কিন্তু ড্রাইভারের ক্রমাগত প্ররোচনায় আর কমিশনের লোভে আজকাল সে ভিড় বাড়াতে 'লেট'-এরও পরোয়া করে না। কেমন যেন নেশা লেগে গেছে তার:

পয়সা – আরো পয়সা ; একটি লোককে, একটি মালকেও সে ছাড়বে না বিনা পয়সায়।

অথচ দু'মাস আগেও সুরেন ছিল সামান্য লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে। দু'মাস আগেও সে বাসে চড়েছে কন্‌ডাক্‌টার হয়ে নয়, যাত্রী হয়ে। দু'মাসে সে বদলে গেছে। খাকির জামার নীচে ঢাকা পড়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারাটা। বাংলার বদলে হিন্দী বুলিতে হয়েছে অভ্যস্ত। হাতের রিস্টওয়াচটাকে তবুও সে ভদ্রলোকের নিদর্শন হিসাবে মনে করে ; তাই ওটা নিয়ে তার একটু গর্বই আছে। যদিও কন্‌ডাক্‌টারী তার সয়ে গেছে, তবুও সে নিজেকে মজুর বলে ভাবতে পারে না। ঘামে ভেজা খাকির জামাটার মতোই অস্বস্তিকর ঐ 'মজুর' শব্দটা।

—এই কন্‌ডাক্‌টার, বাঁধো, বাঁধো। একটা অতিব্যস্ত প্যাসেঞ্জার উঠে দাঁড়াল। তবুও সুরেন নির্বিকার। বাস 'স্টপেজ' ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। লোকটি খাপ্পা হয়ে উঠল : কী শুনতে পাওনা না কি তুমি ?

সুরেনও চোখ পাকিয়ে বলল : আপনি 'তুমি' বলছেন কাকে ?

—তুমি বলব না তো কি 'হুজুর' বলব ? লোকটি রাগে গজগজ করতে করতে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জারদেরও কেউ কেউ মন্তব্য করল : কন্‌ডাক্‌টাররাও আজকাল ভদ্দরলোক হয়েছে, কালে কালে কতই হবে।

একটি পান-খেকো লুঙ্গিপরা লোক, বোধহয় পকেটমার, হেসে কথাটা সমর্থন করল। বলল : মার না খেলে ঠিক থাকে না শালারা, শালাদের দেমাক হয়েছে আজকাল।

আগুন জ্বলে উঠল সুরেনের চোখে। নাঃ, একদিন নির্ঘাৎ মারামারি হবে।···একটা প্যাসেঞ্জার নেমে গেল। ধাঁই-ধাঁই বাসের গায়ে দু'তিনটে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল সুরেন : যা-ওঃ। রাগে গরগর করতে করতে সুরেন ভাবল : ওঃ, যদি মামা তাকে না তাড়িয়ে দিত বাড়ি থেকে।. তা হলে কি আর···কি এমন আর অপরাধ

করেছিল সে। ভাড়াটেদের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে প্রেম করা কি গো-মাংস খাওয়ার মতো অপরাধ? উনিশ বছর বয়সে থার্ডক্লাশে উঠে প্রেম করে না কোন মহাপুরুষ?

—এই শালা শুয়ার কি বাচ্চা, ড্রাইভারের সঙ্গে সুরেনও চেঁচিয়ে উঠল। একটুকুর জন্যে চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল লোকটা। আবার ঘন্টি দিয়ে সুরেন চেঁচিয়ে উঠল: যা-ওঃ, ঠিক হ্যায়। লোকটার ভাগ্যের তারিফ করতে লাগল সমস্ত প্যাসেঞ্জার।

সুরেনকে কিছুতেই মদ খাওয়াতে পারল না রামচরণ ড্রাইভার। সুরেন বোধহয় এখনো আবার ভদ্রলোক হবার আশা রাখে। এখনো তার কাছে কুৎসিত মনে হয় রামচরণদের ইঙ্গিতগুলো। বিশেষ করে বীভৎস লাগে রাত্রিবেলার অনুরোধ। ওরা কত করে গুণ ব্যাখ্যা করে মদের: মাইরি মাল না টানলে কি দিনভোর এমন গাড়ি টানা যায়? তুই খেয়ে দেখ, দেখবি সারাদিন কত ফুর্তিতে কাজ করতে পারবি। তাই নয়? কি বল গো পাঁড়েজী?

পাঁড়েজী ড্রাইভার মাথা নেড়ে রামচরণের কথা সমর্থন করে। অনুরোধ ক'রে ক'রে নিষ্ফল হয়ে শেষে রামচরণ রুখে উঠে ভেঙচি কেটে বলে: এঃ শালা আমার গুরু-ঠাকুর এয়েছেন।

সুরেন মৃদু হেসে সিগারেট বার করে।

যথারীতি সেদিনও "জোড়া-মন্দির—জোড়া-মন্দির" বলে হাঁকার পর গাড়ি ছেড়ে দিল। উ-উ-উ শব্দ করতে করতে একটা স্টপেজে এসে থামতেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠল: জল্‌দি করুন বাবু, জল্‌দি করুন। এক ভদ্রলোক উঠলেন স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে। সুরেন অভ্যাস মতো "লেডিস্ সিট ছেড়ে দিন আপনারা" বলেই আগন্তুকদের দিকে চেয়ে চমকে উঠল—একি, এরা যে তার মামার বাড়ির ভাড়াটেরা। গৌরীও রয়েছে এদের সঙ্গে। সুরেনের বুকের ভিতরটা ধ্বক্-ধ্বক্ কাঁপতে লাগল বাসের ইঞ্জিনটার মতো। ভাড়াটেবাবু সুরেনকে এক

নজর দেখে নিলেন। তাঁর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটো হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল : মা, মা, আমাদের সুরেন-দা, ঐ দ্যাখো সুরেন-দা। কী মজা! ও সুরেন-দা, বাড়িতে যাওনা কেন? এ্যাঁ?

গাড়ি শুদ্ধ লোকের সামনে সুরেন বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ টিকিট দিতেই মনে রইল না তার। ভদ্রলোক ধমকে নিরস্ত করলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সবকিছুই—বন্ধ হয়ে গেল সুরেনের হাঁক ডাক। একবার আড়চোখে তাকাল সে গৌরীর দিকে—সে তখন রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আস্তে আস্তে সে বাকী টিকিটের দামগুলো সংগ্রহ করতে লাগল। বাসের একটানা উঁ-উঁ-উঁ শব্দকে এই প্রথম তার নিজের বুকের আর্তনাদ বলে মনে হল। কন্‌ডাক্‌টারীর দুঃসহ গ্লানি ঘাম হয়ে ফুটে বেরুল তার কপালে।

গৌরীর বিমুখ ভাব সুরেনের শিরায় শিরায় বইয়ে দিল তুষারের ঝড়; দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত মনে হল বাসের ঝাঁকুনি-দেওয়া গতি। বহুদিনের রক্ত-জল-করা পরিশ্রম আর আশা চূড়ান্ত বিন্দুতে এসে কাঁপতে লাগল স্পিডোমিটারের মতো। একটু চাহনি, একটু পলক ফেলা আশ্বাস, এরই জন্যে সে কাঁধে তুলে নিয়েছিল কন্‌ডাক্‌টারের ব্যাগ। কিন্তু আজ মনে হল বাসের সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, সবাই মৃদু মৃদু হাসছে, এমন কি গৌরীর বাবাও। ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা হল সুরেনের টাকাকড়ি-শুদ্ধ কাঁধে ঝোলান ব্যাগটা।

ওরা নেমে যেতেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘন্টি মেরে দুর্বল স্বরে হাঁকল : যা-ওঃ। কিন্তু 'ঠিক হ্যায়' সে বলতে পারল না। কেবল বার বার তার মনে হতে লাগল : নেহি, ঠিক নেহি হ্যায়।

সেদিন রাত্রে সুরেন মদ খেল, প্রচুর মদ। তারপর রামচরণকে অনুসরণ করল। যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়াই রামচরণের কাজ। সে আজ সুরেনকে পৌঁছে দিল সৌখিন ভদ্রসমাজ থেকে ঘা-খাওয়া ছোটলোকের সমাজে।

□

দরদী কিশোর[৪]

দোতলার ঘরে পড়ার সময় শতদ্রু আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। জানলা দিয়ে সে দেখতে পায় তাদের বাড়ির সামনের বস্তিটার জন্যে যে নতুন কণ্ট্রোলের দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভীড়, আর চালের জন্যে মারামারি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আর মূর্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্কুলের পড়া ভুলে যায়, অন্যায় অত্যাচার দেখে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তবু সে নিরুপায়, বাড়ির কঠোর শাসন আর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা অসম্ভব। যারা চাল না পেয়ে ফিরে যায় তাদের হতাশায় অন্ধকার মুখ তাকে যেন চাবুক মারে, এদের দুঃখ মোচনের জন্য কিছু করতে শতদ্রু উৎসুক হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে মনেপ্রাণে। তারই সহপাঠী শিবুকে সে পড়া ফেলে প্রতিদিন চালের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখে। বেচারার আর স্কুলে যাওয়া হয় না, কোনো কোনো দিন চাল না পেয়েই বাড়ি ফেরে, আর বৃদ্ধ বাপের গালিগালাজ শোনে, আবার মাঝে মাঝে মারও খায়। ওর জন্যে শতদ্রুর কষ্ট হয়। অবশেষে ঐ বস্তিটার কষ্ট ঘোচাতে শতদ্রু একদিন কৃতসংকল্প হল।

কিছুদিনের মধ্যেই শতদ্রুর সহপাঠীরা জানতে পারল শতদ্রুর পরিবর্তন হয়েছে। সে নিয়মিত খেলার মাঠে আসে না, কারুর কাছে এ্যাডভেঞ্চারের বই ধার চায় না, এমন কী 'হাফ-হলি-ডে'তে 'ম্যাটিনি শো'-এ সিনেমায় পর্যন্ত যায় না। একজন ছেলে, শতদ্রু দল ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, তলে তলে খোঁজ নিয়ে জানলো শতদ্রু কী এক 'কিশোর-বাহিনী' গ'ড়ে তুলেছে। তারা প্রথমে খুব একচোট হাসল, তারপর শতদ্রুকে পেয়েই অনবরত খ্যাপাতে শুরু করল। কিন্তু শতদ্রু আজকাল গ্রাহ্য করে না, সে চুপি চুপি তার কাজ করে যেতে লাগল। বাস্তবিক, আজকাল তার মন থেকে

এ্যাডভেঞ্চারের, ক্লাবের আর সিনেমার নেশা মুছে গেছে। সে আজকাল বড় হবার স্বপ্ন দেখছে। তা ছাড়া সবচেয়ে গোপন কথা, সে একজন কম্যুনিস্টের সঙ্গে মিশে অনেক কিছুই জানতে পারছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে একটা কিশোর-বাহিনীর ভলান্টিয়ার দল গ'ড়ে, বাড়ির সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা তাকে নিরস্ত করতে পারল না, বরং সে গোপনে কাজ করতে করতে অনুভব করল, সে-ও তো একজন দেশকর্মী। শতদ্রু ভবিষ্যৎ নেতা হবার স্বপ্নে রাঙিয়ে উঠল আর সে খুঁজতে লাগল কঠিন কাজ, আরো কঠিন কাজ, তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। সে আজকাল আর আগের কালের 'শতু' নয়, সে এখন 'কমরেড শতদ্রু রায়'। রুশ-কিশোরদের আত্মত্যাগ আর বীরত্ব শতদ্রুকে অস্থির ক'রে তোলে; সে মুখে কিছু বলে না বটে কিন্তু মনে মনে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল একটা কঠিন কাজ, একটা আত্মত্যাগের সুবর্ণ সুযোগ। অবশেষে সে আত্মত্যাগ করল, কিন্তু তার ফল হল মারাত্মক।

শতদ্রুর কাছ থেকে খবর পেয়ে ভলান্টিয়াররা শতদ্রুদের বাড়িতে উপস্থিত হল। শতদ্রুর বাবা অফিস যাবার আগে খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের খবর দেখছিলেন, একপাল ছেলেকে ঢুকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমরা 'কিশোর-বাহিনী'র ভলান্টিয়ার। আপনার ছেলের মুখে শুনলাম আপনি নাকি ষাট মণ চাল বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন, সেগুলো বস্তির জন্য দিতে হবে। আমরা অবিশ্যি আধা দরে আপনার চাল বিক্রি করে ষাট মণের দাম দিয়ে দেব। আর তাতে রাজী না হলে আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হব না।

—আমার ছেলে, এ খবর দিয়েছে, না?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, নিয়ে যাও।

ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে চাল বের করে আনল। তারা লক্ষ্য করল না, শতদ্রুর বাবার কী জ্বলন্ত চোখ! শতদ্রুর বাবা সেদিন অফিস না গিয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

সেইদিন দুপুরে একটা আর্ত-চিৎকার ভেসে এল বস্তির লোকদের কানে। তারা বুঝল না কিসের আর্তনাদ। বুঝতে পারলে হয়তো সমবেদনায় ব্যথিত হত, কিন্তু তারা সদ্য পাওয়া চাল নিয়েই ব্যস্ত রইল। বহুক্ষণ ধরে অমানুষিক অত্যাচারের পর, শতদ্রুকে তার পড়ার ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা হল। কিন্তু শতদ্রু এতে এতটুকু দুঃখিত নয়, এতটুকু অনুশোচনা জাগল না তার মনে। সে ভাবল: এতো তুচ্ছ, এতো সামান্য নিপীড়ন, রুশিয়ার বীরদের অথবা কায়ুর কমরেডদের তুলনায় তার আত্মত্যাগ এমন কিছু নয়। তবু একটা কিছু করার আনন্দে সে শিউরে উঠল, আর এই কান্নায় তার মন পবিত্র শুচিস্নিগ্ধ হল। জানালা দিয়ে সে চেয়ে দেখল যে-বাড়িতে আজ দুদিন উনুনে আগুন পড়েনি সেখান থেকে উঠছে ধোঁয়া; বহুদিন পরে শিবু স্কুল থেকে ফিরছে, আর কন্ট্রোলের দোকানের লাইনে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত শৃঙ্খলা। কোথাও চাল না-পাওয়ার খবর নেই। সকলের মুখেই হাসি—যেন শতদ্রুর প্রতি অকৃপণ আশীর্বাদ। একটু পরে কান্নার বদলে শতদ্রুর কণ্ঠে গুনগুন করে উঠল 'কিশোর-বাহিনী'র গান।

□

কিশোরের স্বপ্ন[৫]

রবিবার দুপুরে রিলিফ কিচেনের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে জয়দ্রথ বাড়ি ফিরে 'বাংলার কিশোর আন্দোলন' বইটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল, পড়তে পড়তে ক্রমশ বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে এল, আর সে ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেল।

মহাত্মাজীর প্রতি

মহাত্মা, তুমি পাঠিয়েছ ঘোষণা দেশান্তরে,
কুটিরে কুটিরে দ্রুত খবর —
তুলেছে মুক্তি দাবী তুফান প্রাণের পরে,
তুমি শান্তির অস্ফুট বাণী।
মহাত্মা, আজ কিভাবে আশিস তোমার পানে
তুমি যে মুক্তি রচনা করো,
তারই সেনা: হাজারে হাজারে এগিয়ে আসে
তোমার দু'হাতে সকলে ভিড়ো,
হে বন্ধু আজ তুমি বিদ্যুৎ অন্ধকারে
যে আলোয় দ্রুত পথকে চেনা;
সমরে জেতা দৃপ্ত গেরিলা — এক সাথে
দুই হাতের মেটায় দেনা,
তোমার মন্ত্র কানে কানে ফেরে সংগোপনে
অত্যাচারীদের বিভ্রান্তি:
মেতেছে জনতা মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটনে;
— তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষার অশান্তি।
কমলের ক্ষেতে রক্ত-সেচন করে
মৃত্যুর ঢেউ কারখানাতে —
উদ্ধত আকাশ ভরে অসময় আর্তস্বরে:
বন্দী বিদ্রোহ হুকুমাতে।

(২)

প্রথম পাহাড়ে তোমাকেই মুক্ত মহাত্মাজী
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুখর নামে
বিপ্লবী-পথে মিলেছে সবার বন্ধু তিনি;
মুক্তির ভোর আঘাত হানে।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
সত্য শিবিরে লাগানো আগুন নীরব পোড়ে
— অহিংস-ইশারার জনতাকে।
হিংস্র ঝুলে আজ মুক্তির পতাকা ওড়ে
তাইতো প্রশ্ন তুমি কে,
নাম শুধু পারনি ঘুচাতে [illegible]
সাড়ে সংগীত কুহরণাতে.
অস্ত্র জীবন ভরিয়ে দেবে মামলাতাকায়:
সংগ্রাম-মন্ত্র সকল হাতে,
লক্ষ জনতা রক্তে শপথ ঘোষণা করে
'আমরা নই তো মৃত্যুভীত'
তৈরী আমরা: দুনিয়াজোড়া প্রতীক্ষার
জানি তুমি আলো জ্বালি বন্ধু উঠো,'
তোমার দেশের পথে প্রান্তরে তোমার দেখিছে:
'তোমার কে আছে মুক্তিকামী?'
কিন্তু করেছ তোমার সে ঋণ স্বীকারেও যে

চারিদিকে বিপুল—ভীষণ অন্ধকার। সে-অন্ধকারে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই জ্বলে উঠল সহস্র সহস্র শিখায় এক বিরাট চিতা ; আর শোনা গেল লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আর্তনাদ—ভয়ে জয়দ্রথের হাত পা হিম হয়ে যাবার উপক্রম হতেই সে পিছনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল—অসহ্য সে আর্তনাদ ; আর সেই চিতার আগুনে তার নিজের হাত পা-ও আর একটু হলে ঝল্‌সে যাচ্ছিল।

আবার অন্ধকার। চারিদিকে মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কে যেন তার পিঠে একটি শীর্ণ, শীতল হাত রাখল। জয়দ্রথ চমকে উঠল : 'কে ?'

তার সামনে দাঁড়িয়ে সারা দেহ শতচ্ছিন্ন কালো কাপড়ে ঢাকা একটি মেয়ে-মূর্তি। মেয়েটি একটু কেঁপে উঠল, তারপর ক্ষীণ, কাতর স্বরে গোঙাতে গোঙাতে বলল : আমাকে চিনতে পারছ না ? তা পারবে কেন, আমার কি আর সেদিন আছে ? তুমি আমার ছেলে হয়েও তাই আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না···দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে : আমি তোমার দেশ !···

বিস্ময়ে জয় আর একটু হলে মূর্ছা যেত : 'তুমি ?'

'—হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না ?' ম্লান হাসে বাংলা দেশ।

—তোমার এ অবস্থা কেন ?

জয়ের দরদ মাখান কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল বাংলা।

—খেতে পাই না বাবা, খেতে পাই না···

—কেন, সরকার কি তোমায় কিছু খেতে দেয় না ?

বাংলার এত দুঃখেও হাসি পেল : কোন দিন সে দিয়েছে খেতে ? আমাকে খেতে দেওয়া তো তার ইচ্ছা নয়, চিরকাল না খাইয়েই রেখেছে আমাকে ; আমি যাতে খেতে না পাই, তার বাঁধনের হাত থেকে মুক্তি না পাই, সেজন্যে সে আমার ছেলেদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে তাকে টিকিয়েই রেখেছে। আজ যখন আমার এত কষ্ট,

তখনও আমার উপযুক্ত ছেলেদের আমার মুখে এক ফোঁটা জল দেবারও ব্যবস্থা না রেখে আটকে রেখেছে—তাই সরকারের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় কষ্ট দিও না·····

জয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে সেই কাপড়ে ঢাকা রহস্যময়ী মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে : তোমার ঘোমটা-টা একটু খুলবে ? তোমায় আমি দেখব।

বাংলা তার ঘোমটা খুলতেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ক'রে উঠল জয় : উঃ, কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তোমার! আচ্ছা তোমার দিকে চাইবার মতো কেউ নেই দেশের মধ্যে ?

—না, বাবা। সুসন্তান ব'লে, আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে ব'লে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মন্ত্রী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে, আমি যে এদিকে মরে যাচ্ছি, সেদিকে নজর নেই, চিতার ওপর বোধহয় ওরা মন্ত্রীর সিংহাসন পাতবে···

—তোমাকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই ?

—আছে। তোমরা যদি সরকারের ওপর ভরসা না করে, নিজেরাই একজোট হয়ে আমাকে খাওয়াবার ভার নাও, তা হলেই আমি বাঁচব···

হঠাৎ জয় ব'লে উঠল : তোমার মুখে ওগুলো কিসের দাগ ?

—এগুলো ? কতকগুলো বিদেশী শত্রুর চর বছর খানেক ধরে লুটপাট ক'রে, রেল-লাইন তুলে, ইস্কুল-কলেজ পুড়িয়ে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করছিল, এ তারই দাগ। তারা প্রথম প্রথম 'আমার' ভাল হবে বলে আমার নিজের ছেলেদেরও দলে টেনেছিল, কিন্তু তারা প্রায় সবাই তাদের ভুল বুঝেছে, তাই এখন ক্রমশ আমার ঘা শুকিয়ে আসছে। তোমরা খুব সাবধান!···এদের চিনে রাখ ; আর কখনো এদের ফাঁদে পা দিও না আমাকে খুন করতে···

জয় আর একবার বাংলার দিকে ভাল ক'রে তাকায়, ঠিক যেন

কলকাতার মরো মরো ভিখারীর মতো চেহারা হয়েছে। হঠাৎ পায়ের দিকে তাকিয়েই সে চীৎকার ক'রে ওঠে : এ কী ?

দেখে পা দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ছে।

—তোমার এ অবস্থা কে করলে ?

হঠাৎ বাংলার ক্লান্ত চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললে :—জাপান। ···খিদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচতুম, কিন্তু এর হাত থেকে বোধহয় বাঁচতে পারব না···

জয় বুক ফুলিয়ে বলে : আমরা, ছোটরা থাকতে তোমার ভয় কী ?

'—পারবে ? পারবে আমাকে বাঁচাতে ?' বাংলা দুর্বল হাতে জয়কে কোলে তুলে নিল।

বাংলার কোলে উঠে জয় আবেগে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

—তুমি কিছু ভেব না। বড়রা কিছু না করে তো আমরা আছি।

বাংলা বলে : তুমি যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, তা হলে তোমায় সাহায্য করবে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমার মজুর কিষাণ ভাইরা। তারা আমায় তোমার মতোই বাঁচাতে চায়, তোমার মতোই ভালবাসে। আমার কিষাণ ছেলেরা আমার মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যে দিনরাত কী পরিশ্রমই না করছে ; আর মজুর ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে আমার কাপড় যোগাবার জন্যে।

জয় বলে : আর আমরা ? তোমার ছোট্ট দুষ্টু ছেলেরা ?

বাংলা হাসল, 'তোমরাও পাড়ায় পাড়ায় তোমাদের ছোট্ট হাত দিয়ে আমায় খাওয়াবার চেষ্টা করছ।'

জয় আনন্দে বাংলার বুকে মুখ লুকোয়।

হঠাৎ আকাশ-কাঁপা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। বাংলার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ভয় ফুটে উঠল।

'—ঐ, ঐ তারা আসছে·····সাবধান! শত্রুকে ক্ষমা ক'রো না···তা হলে আমি বাঁচব না।' জয় তার ছোট্ট দু'হাত দিয়ে

বাংলাকে জড়িয়ে ধরল। কী যেন বলতে গেল সে, হঠাৎ শুনতে পেল তার দিদি তিস্তা তাকে ডাকছে :

—ওরে জয়, ওঠ, ওঠ, চারটে বেজে গেছে। তোর কিশোর-বাহিনীর বন্ধুরা, তোর জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

জয় চোখ মেলে দেখে 'বাংলার কিশোর আন্দোলন' বইটা তখনো সে শক্ত ক'রে ধরে আছে।

□

ছন্দ ও আবৃত্তি[৬]

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, সে এখন অনেকটা সাবালক হয়েছে। পয়ার-ত্রিপদীর গতানুগতিকতা থেকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রগতিশীলতায় সে মুক্তি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির আমল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এতকাল পয়ার-ত্রিপদীর একচেটিয়া রাজত্বের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবই বাংলা ছন্দে বিপ্লব এনেছে। মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' মিলের বশ্যতা অস্বীকার করলেও পয়ারের অভিভাবকত্ব ঐ একটি মাত্র শর্তে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বিহারীলাল প্রভৃতির হাতে যে-সম্ভাবনা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তা সার্থক হল। শুধু সার্থক হল বললে খুব অল্পই বলা হয়; আসলে, বিহারীলাল প্রভৃতির হাতে যে-সম্ভাবনা লোহা ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তা ইস্পাতের অস্ত্র হল। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছন্দের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তবু একটি মাত্র ছন্দের উল্লেখ করব, সে হচ্ছে বলাকার ছন্দ। বাস্তবিক, ঐ একটি মাত্র ছন্দ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য জীবনে অদ্ভুত ও চমকপ্রদ ভাবে বিকাশ লাভ করে এবং ঐ ছন্দেরই উন্নত পর্যায় শেষের দিকের কবিতায় খুব বেশী রকম পাওয়া

যায়। সম্ভবত ঐ ছন্দই রবীন্দ্রনাথকে গদ্য-ছন্দে লেখবার প্রেরণা দেয় এবং তার ফলেই বাংলা ছন্দ বাঁধা নিয়মের পর্দা ঘুচিয়ে আজকাল স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারছে। বোধহয়, একমাত্র এই কারণেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বলাকা ছন্দ ঐতিহাসিক।

সত্যেন দত্তের কাছেও বাংলা ছন্দ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। নজরুল ইসলামও স্মরণীয়। নজরুলের ছন্দে ভাদ্রের আকস্মিক প্লাবনের মতো যে বলিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল তা অপসারিত হলেও তার পলিমাটি আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলানোয় সাহায্য করবে। এঁরা দু'জন বাদে এমন কোনো কবিই বাংলা ছন্দে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না, যাঁরা নিজেদের আধুনিক কবি বলে অস্বীকার করেন। অথচ কেবলমাত্র ছন্দের দিক থেকেই যে আধুনিক কবিতা অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে এ কথা অমান্য করার স্পর্ধা বা প্রবৃত্তি অন্তত কারো নেই বলেই আমার মনে হয়।

আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রমাণের আবশ্যক বোধহয় নেই। তারপরেই উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু দে, বিশেষ করে আজকাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছন্দের ঘোড়ায় একজন পাকা ঘোড়-সওয়ার, যদিও সম্প্রতি নিষ্ক্রিয়। অমিয় চক্রবর্তী খুব সম্ভব একটা নতুন ছন্দের সূত্রপাত করবেন, কিন্তু তিনি এখনো পর্যন্ত গবেষণাগারে। গদ্য-ছন্দে সমর সেন-ই দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়। ইতিমধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একখানা চটি বইয়ে ছড়ার ছন্দের উন্নত-ক্রম কত উপভোগ্য হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। বিমলচন্দ্র ঘোষের ঐ ধরনের একখানা বই ঐ কারণেই অতি সুপাঠ্য হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অধুনা আত্ম-সম্বরণ করেছেন, কিন্তু অজিত দত্তের খবর কী? বুদ্ধদেব বসুর ছন্দের ধার দিন দিন কমে যাচ্ছে। তিনি গদ্য-ছন্দে লেখেন না কেন?

অতঃপর অভিযোগ-প্রসঙ্গ—ভাল ছন্দ ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য মনে হচ্ছে। এর প্রতিকারের কোনো উপায় কি নেই? আহার্যের সঙ্গে সঙ্গে

ভাল ছন্দ দুর্লভ হওয়ায় দুটোর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে অদম্য হয়ে উঠছে, সুতরাং ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে কবিদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ লক্ষ্য করব। কোনো কোনো কবির ছন্দের আশঙ্কাজনক প্রভাব অধিকাংশ নবজাত কবিকে অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে আচ্ছন্ন করছে, অতএব দুঃসাহস প্রকাশ করেই তাঁদের সচেতন হতে বলছি। খ্যাতনামা এবং অখ্যাতনামা প্রত্যেক কবির কাছেই দাবি করছি, তাঁদের সমস্তটুকু সম্ভাবনাকে পরিশ্রম করে ফুটিয়ে তুলে বাংলা ছন্দকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। এ কথা যেন ভাবতে না হয় রবীন্দ্রনাথের পরে কারো কাছে আর কিছু আশা করবার নেই।

এইবার আবৃত্তির কথায় আসা যাক। ছন্দের সঙ্গে আবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথচ ছন্দের দিক থেকে অগ্রসর হয়েও বাংলা দেশ আবৃত্তির ব্যাপারে অত্যন্ত অমনোযোগী। আমি খুব কম লোককে ভাল আবৃত্তি করতে দেখেছি। ভাল আবৃত্তি না করার অর্থ ছন্দের প্রকৃতি না বোঝা এবং তারও অর্থ হচ্ছে ছন্দের প্রতি উদাসীনতা। ছন্দের প্রতি পাঠকের ঔদাসীন্য থাকলে ছন্দের চর্চা এবং উন্নতি যে কমে আসবে, এতো জানা কথা।

সুতরাং বাংলা ছন্দের উন্নতির জন্যে সুষ্ঠু আবৃত্তির প্রচলন হওয়া দরকার এবং এ বিষয়ে কবিদের সর্বপ্রথম অগ্রণী হতে হবে। অনেক প্রসিদ্ধ কবিকে আবৃত্তি করতে দেখেছি, যা মোটেই মর্মস্পর্শী হয় না। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, নিখুঁত ধ্বনি-বিন্যাস, কণ্ঠস্বরের সুনিপুণ ব্যঞ্জনা এবং সর্বোপরি ছন্দ সম্বন্ধে সতর্কতা, এইগুলি না হলে আবৃত্তি যে ব্যর্থ হয় তা তাঁদের ধারণায় আসে না।

আগে আমাদের বাংলা দেশে কবির লড়াই, পাঁচালি, কথকতা ইত্যাদির মধ্যে ছন্দ-শিক্ষার কিছুটা ব্যবস্থা ছিল, যদিও তার মধ্যে ভুল-ত্রুটি ছিল প্রচুর, কিন্তু তার ব্যাপকতা সত্যিই শ্রদ্ধেয় এবং উপায়টাও ছিল সহজ। এখন যদি সেই ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন না-ও হয়,

তবুও কবিরা সভা-সমিতিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সাধারণকে ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিতরণ করতে অনায়াসেই পারেন। এ ব্যবস্থা যে একেবারেই নেই তা নয়, তবে খুবই কম। রেডিও-কর্তৃপক্ষ যদি প্রায়ই কবিদের আমন্ত্রণ ক'রে (নিজেদের মাইনে করা লোক দিয়ে নয়, যাদের থিয়েটারী ঢঙে আবৃত্তি করাই চাকরি বজায় রাখার উপায়) আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে ছন্দ-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা হলেও জনসাধারণ উপকৃত হয়। সিনেমায় যদি নায়ক-নায়িকা বিশেষ মুহূর্তে দু'চার লাইন রবীন্দ্রনাথের কি নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে তা হলে কি রসভঙ্গ হবে ?

যদি সত্যিই ছন্দ সম্বন্ধে কাউকে সচেতন করতে হয় তা হলে তা কিশোরদের। তারা ছড়ার মধ্যে দিয়ে তা শিখতে পারে। আর তারা যদি তা শেখে তা হলে ভবিষ্যতে কাউকে আর আবৃত্তি-শিক্ষার জন্যে পত্রিকায় লেখা লিখতে হবে না। কাজেই ভাল আবৃত্তি ও ছন্দের জন্যে একেবারে গোড়ায় জল ঢালতে হবে এবং সেইজন্যে মায়েদের দৃষ্টি এই দিকে দেওয়া দরকার। তাঁরা ঘুম-পাড়ানি গানের সময় কেবল সেকেলে 'ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি' না ক'রে রবীন্দ্রনাথ কি সুকুমার রায়ের ছড়া আবৃত্তি ক'রে জ্ঞান হবার আগে থেকেই ছন্দে কান পাকিয়ে রাখতে পারেন। এ হবে এস্‌রাজ বাজানোর আগে ঠিক সুরে তার বেঁধে নেওয়ার মতো। প্রত্যেক বিদ্যায়তনের শিক্ষকের দায়িত্ব আরো বেশী, কেবলমাত্র তাঁরাই পারেন এ ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা দিতে। প্রতিদিন কবিতা মুখস্থ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে, পুরস্কার বিতরণ কি সরস্বতী পূজো উপলক্ষ্যে ছাত্রদের আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে কি করে ছন্দে পড়তে হয়, আবৃত্তি করতে হয় তা তাঁরা শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষার মতো এ শিক্ষায়ও তাঁরা ফাঁকি দেন।

পরিশেষে আমার মন্তব্য হচ্ছে, গদ্য-ছন্দের যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে, সেটাও যে পদ্যের মতোই পড়া যায়, তা অনেকেই জানেন না। কেউ কেউ গল্প পড়ার মতোই তা পড়েন। সুতরাং উভয়বিধ

"অনুবাদ

– কোনো এক কিশোর

"সর্বভৌম জ্যামিতির ছড়া

Food Problem
(একটি প্রাথমিক সমস্যার সহজ সমাধানে)

স্বীকার্য:

আমাকে দেখে এক উন্মাদ বলেছে নেই খাদ্য;
'খাদ্য' নেই প্রমাণ করাই আমার 'সাধ্য'।"

কল্পনা:

ধরেছি, অবাধে জনগণ অতি অধিকাংশ,
সমান্তরালে বাড়াতে হবে লোকসংখ্যা 'লক্ষ্যে'।
"খাদ্য নেই" এর প্রথম পাওয়া সুর সরল রেখাতে
সমান্তরাল 'লক্ষ্য' অর্থাৎ আমাকে হবে দেখাতে।

*

অঙ্কন:

অখণ্ড ভারতের দেহটির মধ্যবিন্দু থেকে,
প্রতিবেশীর বিন্দুতে টানো একটি রেখা এঁকে।
হিন্দু-মুসলমানের কেন্দ্র, দুদিকের দুই 'কোণে',
যুক্ত করি উভয়কে এক প্রতিবেশীর সনে।
প্রতিবেশীর বিন্দুতে দুই কোণ যদি মেলে,
সাথে সাথেই খাদ্য পাওয়ার হদিস বুঝি মেলে।

*

প্রমাণ:

খাদ্য এবং প্রতিবেশী উভয়েরই নেই,
হিন্দু এবং মুসলমানের মিলন হবে সেই।
উভয়ের নেই স্বাধীনতা, উভয় দুটিই সমান,
দিকে দিকে 'খাদ্য নেও' একতারই প্রমাণ।
প্রতিবেশীর সঠিক পথে অগ্রসর হবার,
[illegible] খবরের খাদ্য পাবে তবে ।।

– সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছন্দ সম্বন্ধে যত্ন নিতে হবে লেখক ও পাঠক উভয়কেই। কবিরা নতুন নতুন আবৃত্তি-উপযোগী ছন্দে লিখলে (যা আধুনিক কবিরা লেখেন না) এবং পাঠকরা তা ঠিকমতো পড়লে তবেই আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, উপেক্ষিত আধুনিক কবিতা খেচর অবস্থা থেকে ক্রমশ জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে।

□

বর্ষ-বাণী[৭]

বৈশাখী (গান)

—আহ্বান—

এসো এসো এসো হে নবীন
এসো এসো হে বৈশাখ,
এসো আলো এসো হে প্রাণ
ডাকো কালবৈশাখীর ডাক।
বাতাসে আনো ঝড়ের সুর
যুক্ত করো নিকট-দূর।
মুক্ত করো শতাব্দীরে দিনের প্রতিদানে,
ঝঞ্ঝা আনো বজ্র হানো বিজলী জ্বাল প্রাণে।
পুরানো দিন তপ্ত বায়ে আজকে ঝ'রে যাক॥

বসন্তেরই শান্ত বায়ে পল্লবিনী-লতা
তরুর কোলে দোলনরত লজ্জা-অবনতা।
প্রভাতী-ডাকে তাহারে ডাকো
একেলা কানে কানে
প্রলয় সুরে নাট্যশালা ভরিয়া তোল গানে।

মেঘের বুকে কাজল আঁকো,
জাগাও ঘূর্ণিপাক ॥
নিঃস্ব করো বিশ্ব ভুবন দুঃখ দহন-তাপে
শুষ্ক করো রুক্ষ করো কঠিন অভিশাপে।
হে সন্ন্যাসী একেলা আসি
রিক্ত-ঝুলি হ'তে
দিলে যে দান জ্বলিল প্রাণ
পুড়িল আরও ওতে।
তৃষ্ণাময়ী ধরণী আজি করুণা মাগে তব
নবীনপ্রাণ নবীনদান আনো হে নব বন।
পিছনে তাই বৈশাখী ঝড় আশাসে তুলে হাঁক ॥

□

গান[৮]

যেমন ক'রে তপন টানে জল
তেমনি ক'রে তোমায় অবিরল
টানছি দিনে দিনে
তুমি লও গো আমায় চিনে
শুধু ঘোচাও তোমার ছল ॥

জানি আমি তোমায় বলা বৃথা
তুমি আমার আমি তোমার মিতা,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তুমি আসবে নাকো ভুলে
থামবে নাকো আমার চলাচল ॥

জনযুদ্ধের গান[৯]

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,
জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলছে ভারত আর বীর মহাচীন।
সাম্যবাদীরা আজ মহা ক্রুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।
নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন মগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।
করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ ;
শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ॥

□

গান[১০]

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে
আমরা কিশোর বীর।
আজ বাংলার ঘরে ঘরে আমরা যে সৈনিক মুক্তির।
সেবা আমাদের হাতের অস্ত্র
দুঃখীকে বিলাই অন্ন বস্ত্র
দেশের মুক্তি-দূত যে আমরা
স্ফুলিঙ্গ শক্তির।
আমরা আগুন জ্বালাব মিলনে
পোড়াব শত্রুদল

আমরা ভেঙেছি চীনে সোভিয়েটে
দাসত্ব-শৃঙ্খল।
আমার সাথীরা প্রতি দেশে দেশে
আজো উদ্যত একই উদ্দেশে—
এখানে শত্রুনিধনে নিয়েছি প্রতিজ্ঞা গম্ভীর।

বাঙলার বুকে কালো মহামারী মেলেছে অন্ধপাখা
আমার মায়ের পঞ্জরে নখ বিঁধেছে রক্তমাখা
তবু আজো দেখি হীন ভেদাভেদ!
আমরা মেলাব যত বিচ্ছেদ;
আমরা সৃষ্টি করব পৃথিবী নতুন শতাব্দীর॥

□

গান[১১]

শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে
ঝন্ ঝনা ঝন্ ঝন্
সর্বহারার বন্দী-শিবিরে
ধ্বংসের গর্জন।
দিকে দিকে জাগে প্রস্তুত জনসৈন্য
পালাবে কোথায়? রাস্তা তো নেই অন্য
হাড়ে রচা এই খোঁয়াড় তোমার জন্য
হে শত্রু দুষমন!
যুগান্ত জোড়া জড়রাত্রির শেষে
দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,
রুক্ষ মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে
নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো।

চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়ায়ে দম্ভ
পতাকা উড়াই : মিলিত জয়স্তম্ভ।
মুক্তির ঝড়ে শত্রুরা হতভম্ব।
আমরা কঠিন পণ ॥

□

ভবিষ্যতে[১২]

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন!
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত
তাদের তরে মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।
চাষী মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,
একস্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই ॥
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর ॥

□

সুচিকিৎসা[১৩]

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এ সব কি সুচিকিৎসা?—আরে আরে রামঃ।

আমার হাতে পড়লে পরে 'এক্সরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা— আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।
'ইনজেক্‌শান' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে
তারপরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন ক'রে।"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর ? ধন্য ডাক্তারী !!

□

পরিচয়[১৪]

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
'এক্ষুনি আলো আন্'।
কী বিপদ তা হ'লে
আলো তার না হ'লে
মার খাব আমরা ?
দিলে পরে উত্তর
রেগে বলে 'দুত্তোর,
যত সব দামড়া'।
কেঁদে বলি, শ্রীপদে
বাঁচাও এ বিপদে—
অক্ষম আমাদের।

হেসে বলে শাম-দা
নিয়ে আয় রামদা
ধুবড়ির রামাদের ॥

□

আজিকার দিন কেটে যায়[১৫]

আজিকার দিন কেটে যায়,—
অনলস মধ্যাহ্ন বেলায়
যাহার অক্ষয় মূর্তি পেয়েছিনু খুঁজে
তারি পানে আছি চক্ষু বুজে।
আমি সেই ধনুর্ধর যার শরাসনে
অস্ত্র নাই, দীপ্তি মনে মনে,
দিগন্তের স্তিমিত আলোকে
পূজা চলে অনিত্যের বহ্নিময় স্রোতে।
চলমান নির্বিরোধ ডাক,
আজিকে অন্তর হতে চিরমুক্তি পাক।
কঠিন প্রস্তরমূর্তি ভেঙে যাবে যবে
সেই দিন আমাদের অস্ত্র তার কোষমুক্ত হবে।
সুতরাং রুদ্ধতায় আজিকার দিন
হোক মুক্তিহীন।
প্রথম বাঁশির স্ফূর্তি গুপ্ত উৎস হতে
জীবন-সিন্ধুর বুকে আন্তরিক পোতে
আজিও পায় নি পথ তাই
আমার রুদ্রের পূজা নগণ্য প্রথাই
তবুও আগত দিন ব্যগ্র হয়ে বারংবার চায়
আজিকার দিন কেটে যায় ॥

নদী কোথা যাও?
নদী বলে যাই।
হেসে সাগরেতে
হেলে পাহাড়ের
চল আমরা
যাই আমরাও —

চৈত্রদিনের গান[১৬]

চৈতীরাতের হঠাৎ হাওয়া
আমায় ডেকে বলে,
"বনানী আজ সজীব হ'ল
নতুন ফুলে ফলে।
এখনও কি ঘুম-বিভোল ?
পাতায় পাতায় জানায় দোল
বসন্তেরই হাওয়া।
তোমার নবীন প্রাণে প্রাণে,
কে সে আলোর জোয়ার আনে ?
নিরুদ্দেশের পানে আজি তোমার তরী বাওয়া ;
তোমার প্রাণে দোল দিয়েছে বসন্তেরই হাওয়া।
ওঠ্ রে আজি জাগরে জাগ
সন্ধ্যাকাশে উড়ায় ফাগ
ঘুমের দেশের সুপ্তিহীনা মেয়ে।
তোমার সোনার রথে চ'ড়ে
মুক্তি-পথের লাগাম ধ'রে
ভবিষ্যতের পানে চল আলোর গান গেয়ে।
রক্তস্রোতে তোমার দিন,
চলেছে ভেসে সীমানাহীন।
তারে তুমি মহান্ ক'রে তোল,
তোমার পিছে মৃত্যুমাখা দিনগুলিরে ভোল॥

সুহৃদ্‌বরেষু[১৭]

কাব্যকে জানিতে হয়, দৃষ্টি দোষে নতুবা পতিত
শব্দের ঝঙ্কার শুধু যাহা ক্ষীণ জ্ঞানের অতীত।
রাতকানা দেখে শুধু দিবসের আলোক প্রকাশ,
তার কাছে অর্থহীন রাত্রিকার গভীর আকাশ।
মানুষ কাব্যের স্রষ্টা, কাব্য কবি করে না সৃজন,
কাব্যের নতুন জন্ম, যেই পথ যখনই বিজন।
প্রগতির কথা শুনে হাসি মোর করুণ পর্যায়
নেমে এল (স্বেচ্ছাচার বুঝি বা গর্জায়)।
যখন নতুন ধারা এনে দেয় দুরন্ত প্লাবন
স্বেচ্ছাচার মনে করে নেমে আসে তখনি শ্রাবণ ;
কাব্যের প্রগতি-রথ ? (কারে কহে বুঝিতে অক্ষম,
অশ্বগুলি ইচ্ছামতো চরে খায়, খুঁজিতে মোক্ষম !)
সুজীর্ণ প্রগতি-রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উইয়ের জ্বালায়
সারথি-বাহন ফেলি ইতস্তত বিপথে পালায়।
নতুন রথের পথে মৃতপ্রায় প্রবীণ ঘোটক,
মাথা নেড়ে বুঝে, ইহা অ-রাজযোটক ॥

□

পটভূমি[১৮]

অজাতশত্রু, কতদিন কাল কাটলো :
চিরজীবন কি আবাদ-ই ফসল ফলবে ?
ওগো ত্রিশঙ্কু, নামাবলী আজ সম্বল
টংকারে মূঢ় স্তব্ধ বুকের রক্ত।

কখনো সন্ধ্যা জীবনকে চায় বাঁধতে,
সাদা রাতগুলো স্বপ্নের ছায়া মনে হয়,

মাটির বুকেতে পরিচিত পদশব্দ,
কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি থেকেই অব্যয়।

ভীরু একদিন চেয়েছিল দূর অতীতে
রক্তের গড়া মানুষকে ভালবাসতে ;
তাই বলে আজ পেশাদারী কোন মৃত্যু।
বিপদকে ভয় ? সাম্যের পুনরুক্তি।

সখের শপথ গলিত কালের গর্ভে—
প্রপঞ্চময় এই দুনিয়ার মুষ্টি,
তবু দিন চাই, উপসংহারে নিঃস্ব
নইলে চটুল কালের চপল দৃষ্টি।

পঙ্গু জীবন ; পিচ্ছিল ভীত আত্মা,—
রাত্রির বুকে উদ্যত লাল চক্ষু ;
শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক মৌন মন্ত্রে,
যদি ধরিত্রী একটুও হয় রক্তিম॥

□

ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণে[১১]

অকস্মাৎ মধ্যদিনে গান বন্ধ ক'রে দিল পাখি,
ছিন্নভিন্ন সন্ধ্যাবেলা প্রাত্যহিক মিলনের রাখী ;
ঘরে ঘরে অনেকেই নিঃসঙ্গ একাকী।

ক্লাব উঠে গিয়েছে সফরে,
শূন্য ঘর, শূন্য মাঠ,
ফুল ফোটা মালঞ্চ প'ড়ে
ত্যক্ত এ ক্লাবের কক্ষে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে কখন,
কারো আজ দেখা নেই—
কোথাও বন্ধুর দল ছড়ায় না হাসি,
নিষ্প্রভ ভোজের স্বপ্ন ;
একটি কথাও শব্দ তোলে না বাতাসে—
ক্লাব-ঘরে ধুলো জমে,
বিনা গল্পে সন্ধ্যা হয় ;
চাঁদ ওঠে উন্মুক্ত আকাশে।

খেলোয়াড় খেলে নাকো,
গায়কেরা গায় নাকো গান—
বক্তারা বলে না কথা
সাঁতারুর বন্ধ আজ স্নান।
সর্বস্ব নিয়েছে গোরা তারা মারে উরুতে চাপড়,
যে পথে এ ক্লাব গেছে কে জানে সে পথের খবর ?

সন্ধ্যার আভাস আসে,
জ্বলে না আলোক ক্লাব কক্ষের কোলে,
হাতে হাতে নেই সিগারেট—
তর্কাতর্কি হয় নাকো বিভক্ত দু'দলে ;
অযথা সন্ধ্যায় কোনো অচেনার পদশব্দে
মালীটা হাঁকে না।

মনে পড়ে লেকের সে পথ ?
মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা হাওয়ার চাবুক।
অনেক উজ্জ্বল দৃশ্য এই লেকে
করেছিল উৎসাহিত বুক।
কেরানী, বেকার, ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পী ও ডাক্তার
সকলের কাছে ছিল অবারিত দ্বার,

কাজের গহ্বর থেকে পাখিদের মতো এরা নীড়
সন্ধানে, সন্ধ্যায় ডেকে এনেছিল এইখানে ভিড়।
রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সিনেমার কথা,
এদের রসনা থেকে প্রত্যহ স্খলিত হ'ত অলক্ষ্যে অযথা ;
মাঝে মাঝে অনর্থক উচ্ছ্বসিত হাসি,
বাতাসে ছড়াত নিত্য শব্দ রাশি রাশি।

তারপর অকস্মাৎ ভেঙে গেল রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা,
সহসা চৈতন্যোদয় ; প্রত্যেকের বুকে ফোটে ক্ষুব্ধ রক্তজবা ;
সমস্ত গানের শেষে যেন ভেঙে গেল এক গানের আসর,
যেমন রাত্রির শেষে নিঃশেষে কাঙাল হয় বিবাহ-বাসর।

'জীবন-রক্ষক' এই সমাজের দারুণ অভাবে,
এদের 'জীবন-রক্ষা' হয়তো কঠিন হবে,
হয়তো অনেক প্রাণ যাবে॥

□

"নব জ্যামিতি"র ছড়া[২০]

Food Problem [একটি প্রাথমিক সম্পাদ্যের ছায়া অবলম্বনে]

সিদ্ধান্ত :
আজকে দেশে রব উঠেছে, দেশেতে নেই খাদ্য ;
'আছে', সেটা প্রমাণ করাই অধুনা 'সম্পাদ্য'।

কল্পনা :
মনে করো, আসছে জাপান অতি অবিলম্বে,
সাধারণকে রাখতে হবে লৌহদৃঢ় 'লম্বে'।
"খাদ্য নেই" এর প্রথম পাওয়া খুব 'সরল রেখা'তে,
দেশরক্ষার 'লম্ব' তোলাই আজকে হবে শেখাতে।

[illegible] সকল ভক্তের [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] সময়;
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] হ'লো [illegible]।

নিরুপায়, [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] অঙ্কুর,
তুমি দিয়েছিলে [illegible] আশ্বাস,
জীবনে আনতে [illegible]-অঙ্কুর।
দরিদ্র [illegible] [illegible] [illegible],
মজুর, মজুরের [illegible],
এই আজ [illegible] [illegible]
এক একে সব [illegible]।

— সুকান্ত

অঙ্কন :

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর ক্ষুদ্র বিন্দ্ থেকে,
প্রতিরোধের বিন্দুতে নাও ঐক্য-রেখা এঁকে।
'হিন্দু'-'মুসলমানে'র কেন্দ্রে, দুদিকের দুই 'চাপে',
যুক্ত করো উভয়কে এক প্রতিরোধের ধাপে।
প্রতিরোধের বিন্দুতে দুই জাতি যদি মেলে,
সাথে সাথেই খাদ্য পাওয়ার হদিশ তুমি পেলে।

প্রমাণ :

খাদ্য এবং প্রতিরোধ উভয়েরই চাই,
হিন্দু এবং মুসলমানে মিলন হবে তাই।
উভয়ের চাই স্বাধীনতা, উভয় দাবীই সমান,
দিকে দিকে 'খাদ্যলাভ' একতারই প্রমাণ।
প্রতিরোধের সঠিক পথে অগ্রসর যারা,
ঐক্যবদ্ধ পরস্পর খাদ্য পায় তারা॥

□

জবাব[২১]

আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে
মুক্তি-মগ্ন প্রতিজ্ঞা চারিদিকে
হানবে এবার অজস্র মৃত্যুকে ;
জঙ্গী-জনতা ক্রমাগত সম্মুখে।

শত্রুদল গোপনে আজ, হানো আঘাত
এসেছে দিন ; পতেঙ্গার রক্তপাত
আনে নি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে ?
উষ্ণমন শাণিত হোক সংগীনে।

ক্ষিপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক তুচ্ছ প্রাণ
কাস্তে ধরো, মুঠিতে এক গুচ্ছ ধান।
মর্ম আজ বর্ম সাজ আচ্ছাদন
করুক : চাই এদেশে বীর উৎপাদন।

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির॥

□

চরমপত্র[২২]

তোমাকে দিচ্ছি চরমপত্র রক্তে লেখা ;
অনেক দুঃখে মথিত এ শেষ বিদ্যে শেখা ;
অগণ্য চাষী-মজুর জেগেছে শহরে গ্রামে
সবাই দিচ্ছি চরমপত্র একটি খামে :
পবিত্র এই মাটিতে তোমার মুছে গেছে ঠাঁই,
ক্ষুব্ধ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত 'স্বাধীনতা চাই'।
বহু উপহার দিয়েছ,—শাস্তি, ফাঁসি ও গুলি,
অরাজক, মারী, মন্বন্তরে মাথার খুলি।
তোমার যোগ্য প্রতিনিধি দেশে গড়েছে শ্মশান,
নেড়েছে পর্ণকুটির, কেড়েছে ইজ্জত, মান!
এতদিন বহু আঘাত হেনেছ, পেয়ে গেছ পার,
ভুলি নি আমরা, শুরু হোক শেষ হিসাবটা তার,
ধর্মতলাকে ভুলি নি আমরা, চট্টগ্রাম
সর্বদা মনে অঙ্কুশ হানে নেই বিশ্রাম।

বোম্বাই থেকে শহীদ জীবন আনে সংহতি,
ছড়ায় রক্ত প্লাবন, এদেশে বিদ্যুৎগতি।
আমাদের এই দলাদলি দেখে ভেবেছ তোমার
আয়ু সুদীর্ঘ, যুগ বেপরোয়া গুলি ও বোমার,
সে স্বপ্ন ভোলো চরমপত্র সমুখে গড়ায়,
তোমাদের চোখ-রাঙানিকে আজ বলো কে ডরায় ?
বহু তো অগ্নি বর্ষণ করো সদলবলে,
আমরা জ্বালছি আগুন নেভাও অশ্রুজলে।
স্পর্ধা, তাইতো ভেঙে দিলে শেষ-রক্তের বাঁধ
রোখো বন্যাকে, চরমপত্রে ঘোষণা : জেহাদ॥

□

মেজদাকে : মুক্তির অভিনন্দন[২৩]

তোমাকে দেখেছি আমি অবিচল, দৃপ্ত দুঃসময়ে
ললাটে পড়ে নি রেখা ক্রূরতম সংকটেরও ভয়ে ;
তোমাকে দেখেছি আমি বিপদেও পরিহাস রত
দেখেছি তোমার মধ্যে কোনো এক শক্তি সুসংহত।
দুঃখে শোকে, বারবার অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে
অনাহত, আত্মমগ্ন সমুন্নত জয়ধ্বজা হাতে।
শিল্প ও সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট তোমার হৃদয়
জীবনকে জানো তাই মান নাকো কোনো পরাজয় ;
দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ মন যেন ব্যস্ত ভাগীরথী জল
পথের দু'ধারে তার ছড়ায় যে দানের ফসল,
পরোয়া রাখে না প্রতিদানের তা এমনি উদার,
বহুবার মুখোমুখি হয়েছে সে বিশ্বাসহন্তার।
তবুও অক্ষুণ্ণ মন, যতো হোক নিন্দা ও অখ্যাতি
সহিষ্ণু হৃদয় জানে সর্বদা মানুষের জ্ঞাতি,

তাইতো তোমার মুখে শুনে বাণপ্রস্থের ইঙ্গিত
মনেতে বিস্ময় মানি, শেষে হবে বিরক্তির জিত ?
পৃথিবীকে চেয়ে দেখ, প্রশ্নে ও সংশয়ে থরো থরো,
তোমার মুক্তির সঙ্গে বিশ্বের মুক্তিকে যোগ করো ॥

□

পত্র[২৪]

কাশী গিয়ে হু হু ক'রে কাটলো কয়েক মাস তো,
কেমন আছে মেজাজ ও মন, কেমন আছে স্বাস্থ্য ?
বেজায় রকম ঠাণ্ডা সবাই করছে তো বরদাস্ত ?
খাচ্ছে সবাই সস্তা জিনিস, খাচ্ছে পাঁঠা আস্ত ?

সেলাই কলের কথাটুকু মেজদার হু'কান
স্পর্শ ক'রে গেছে বলেই আমার অনুমান।
ব্যবস্থাটা হবেই, করি অভয় বর দান ;
আশা করি, শুনে হবে উল্লসিত প্রাণ।
এতটা কাল ঠাকুর ও ঝি লোভ সামলে আসতো,
এবার বুঝি লোভের দায়ে হয় তারা বরখাস্ত।

চারুটাও হয়ে গেছে বেজায় বেয়াড়া,
মাথার ওপরে ঝোলে যা খুশীর খাঁড়া।
নতেদা'র বেড়ে গেছে অঙ্গুলি হাড়া,
ঘেলুর পরীক্ষাও হয়ে গেছে সারা ;
এবার খরচ ক'রে কিছু রেল-ভাড়া
মাতিয়ে তুলতে বলি রামধন পাড়া।

এবার বোধহয় ছাড়তে হল কাশী,
ছাড়তে হল শৈলর মা, ইন্দু ও ন'মাসি।

দুঃখ কিসের, কেউ কি সেথায় থাকে বারোমাসই ?
কাশী থাকতে চাইবে তারা যারা স্বর্গবাসী,
আমি কিন্তু কলকাতাতেই থাকতে ভালবাসি।
আমার যুক্তি শুনতে গিয়ে পাচ্ছে কি খুব হাসি ?
লেখা বন্ধ হোক তা হলে, এবার আমি আসি॥

□

মার্শাল তিতোর প্রতি[২৫]

কমরেড, তুমি পাঠালে ঘোষণা দেশান্তরে,
কুটিরে কুটিরে প্রতিধ্বনি,—
তুলেছে মুক্তি দারুণ তুফান প্রাণের ঝড়ে
তুমি শক্তির অটুট খনি।
কমরেড, আজ কিষাণ শ্রমিক তোমার পাশে
তুমি যে মুক্তি রটনা করো,
তারাই সৈন্য : হাজারে হাজারে এগিয়ে আসে
তোমার দু'পাশে সকলে জড়ো।
হে বন্ধু, আজ তুমি বিদ্যুৎ অন্ধকারে
সে আলোয় দ্রুত পথকে চেনা :
সহসা জনতা দৃপ্ত গেরিলা—অত্যাচারে,
দৃঢ় শত্রুর মেটায় দেনা।
তোমার মন্ত্র কোণে কোণে ফেরে সংগোপনে
পথচারীদের ক্ষিপ্রগতি :
মেতেছে জনতা মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটনে :
—ভীরু প্রস্তাবে অসম্মতি।
ফসলের ক্ষেতে শত্রু রক্ত-সেচন করে,
মৃত্যুর ঢেউ কারখানাতে—
তবুও আকাশ ভরে আচমকা আর্তস্বরে :

শত্রু নিহত স্তব্ধ রাতে।
প্রবল পাহাড়ে গোপনে যুদ্ধ সঞ্চারিত
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুখর গানে,
বিপ্লবী পথে মিলেছে এবার বন্ধু তিতো :
মুক্তির ফৌজ আঘাত হানে।
শত্রু শিবিরে লাগানো আগুনে বাঁধন পোড়ে
—অগ্নি ইশারা জনান্তিকে !
ধ্বংসস্তূপে আজ মুক্তির পতাকা ওড়ে
ভাঙার বন্যা চতুর্দিকে।
নামে বসন্ত, পাইন বনের শাখায় শাখায়
গাঢ়-সংগীত তুষারপাতে,
অযুত জীবন ঘনিষ্ঠ দেহে সামনে তাকায় :
মারণ-অস্ত্র সবল হাতে।
লক্ষ জনতা রক্তে শপথ রচনা করে—
'আমরা নই তো মৃত্যুভীত,
তৈরী আমরা ; যুগোশ্লাভের প্রতিটি ঘরে
তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো।'
তোমার সেনানী পথে প্রান্তরে দোসর খোঁজে :
'কোথায় কে আছ মুক্তিকামী ?'
ক্ষিপ্ত করেছে তোমার সে ডাক আমাকেও যে
তাইতো তোমার পেছনে আমি ॥

□

ব্যর্থতা[২৬]

আজকে হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদী
পার হ'তে সাধ জাগে, মনে হয় তবু যদি

পক্ষপাতের বালাই না নিয়ে পক্ষীরাজ,
চাষার ছেলের হাতে এসে যেত হঠাৎ আজ।
তা হলে না হয় আকাশবিহার হ'ত সফল,
টুকরো মেঘেরা যেতে-যেতে ছুঁয়ে যেত কপোল ;
জনারণ্যে কি রাজকন্যার নেইকো ঠাঁই ?
কাস্তেখানাকে বাগিয়ে আজকে ভাবছি তাই।

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষার ছেলের অসিকে কি ভালবাসতে আছে ?
তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে কাস্তে দৃপ্ত-কিরণ।
হে রাজকন্যা, দৈত্যপুরীতে বন্দী থেকে
নিজেকে মুক্ত করতে আমায় নিয়েছ ডেকে।
হেমন্তে পাকা ফসল সামনে, তবু দিলে ডাক ;
তোমাকে মুক্ত করব, আজকে ধান কাটা থাক।

রাজপুত্রের মতন যদিও নেই কৃপাণ,
তবু মনে আশা, তাই কাস্তেতে দিচ্ছি শান,
হে রাজকুমারী, আমাদের ঘরে আসতে তোমার
মন চাইবে তো ? হবে কষ্টের সমুদ্র পার ?
দৈত্যশালায় পাথরের ঘর, পালঙ্ক-খাট,
আমাদের শুধু পর্ণ-কুটির, ফাঁকা ক্ষেত-মাঠ ;
সোনার শিকল নেই, আমাদের মুক্ত আকাশ,
রাজার ঝিয়ারী ! এখানে নিদ্রাহীন বারো মাস।

এখানে দিন ও রাত্রি পরিশ্রমেই কাটে
সূর্য এখানে দ্রুত ওঠে, নামে দেরিতে পাটে।
হে রাজকন্যা, চলো যাই, আজ এলাম পাশে,
পক্ষীরাজের অভাবে পা দেব কোমল ঘাসে।

হে রাজকন্যা সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান ?
হে রাজকন্যা, ঘুম ভাঙলো না ? সোনার কাঠি
কোথা থেকে পাব, আমরা নিঃস্ব, ক্ষেতেই খাটি।
সোনার কাঠির সোনা নেই, আছে ধানের সোনা,
তাতে কি হবে না ? তবে তো বৃথাই অনুশোচনা ॥

□

দেবদারু গাছে রোদের ঝলক[২৭]

দেবদারু গাছে রোদের ঝলক, হেমন্তে ঝরে পাতা,
সারাদিন ধ'রে মুরগীরা ডাকে, এই নিয়ে দিন গাঁথা।
রক্তের ঝড় বাইরে বইছে, ছোটে হিংসার ঢেউ,
খবরে কাগজ জানায় সেকথা, চোখে দেখি নাকো কেউ ॥

□

১। 'ক্ষুধা' গল্পটি ২রা এপ্রিল ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অরুণাচলকে লেখা ২৭শে চৈত্র ১৩৪৯ তারিখের চিঠিতে এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন সুকান্ত।

২। 'দুর্বোধ্য' গল্পটি ২৮শে মে ১৯৪৩-এর অরণি পত্রিকায় চিত্র-গল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

৩। 'ভদ্রলোক' গল্পটিও অরণিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। 'দরদী কিশোর' গল্পটি সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ পত্রিকায় কিশোর বিভাগে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫। 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পটি জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে ৬ই অক্টোবর ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। জনযুদ্ধের প্রকাশিত গল্প দুটি শ্রীসুধী প্রধানের সহায়তায় সংগৃহীত।

৬। 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪-এর অরণিতে প্রকাশিত হয়েছে।

৭। গানটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০। এটি 'সূর্য-প্রণাম'-এর সমকালীন একটি অসম্পূর্ণ গীতিকাব্যের প্রথমাংশ বলে মনে হয়।

৮। এই গানটি শ্রীবিমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। গানটি গীতিগুচ্ছের গানগুলির সমকালীন বলে মনে হয়।

৯। সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'জনযুদ্ধের গান' সংকলন গ্রন্থটি থেকে এই গানটি সংগৃহীত।

১০। গানটি মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৬২-তে প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটিও পাওয়া গেছে। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩-৪৪ সাল।

১১। গানটির রচনাকাল ১৯শে জুলাই ১৯৪৪ সাল।

১২-১৩। 'ভবিষ্যতে' ও 'সুচিকিৎসা'—এই ছড়া দুটি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'সুকান্ত-প্রসঙ্গ', 'শারদীয়া বসুমতী', ১৩৫৪-থেকে সংগৃহীত। পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এগুলি ১৯৪০-এর আগের লেখা বলে অনুমিত।

১৪। 'পরিচয়' ছড়াটির রচনাকাল ১৯৩৯-৪০ সাল বলে মনে হয়।

১৫। এই কবিতাটিও ভূপেন্দ্রনাথের 'সুকান্ত-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। এটি ১৯৪০-এর আগের রচনা।

১৬। 'চৈত্রদিনের গান' কবিতাটি বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ছোটদের 'শিখা' পত্রিকার জন্য রচিত। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০।

১৭। এই কবিতাটি অরুণাচলকে সুকান্ত পত্রাকারে লিখেছিলেন। রচনার তারিখ ১৩ই কার্তিক ১৩৪৮।

১৮। 'পটভূমি' কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪২-৪৩।

১৯। 'ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস (শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)'—এই শিরোনামায় কবিতাটি লেখা হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার লেক অঞ্চলের 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি'র সদস্য ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লেকে যুদ্ধকালীন মিলিটারী ক্যাম্প হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে সুকান্ত এই কবিতাটি লিখেছিলেন।

২০। 'নব জ্যামিতি'র ছড়া সাপ্তাহিক জনযুদ্ধের কিশোর বিভাগে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩।

২১। 'জবাব' কবিতাটি কার্তিক ১৩৫০-এর পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২২। 'চরমপত্র' কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৫।

২৩। ১৯৪৪ সালে সুকান্তর মেজদা রাখাল ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন। তাঁর মুক্তি উপলক্ষে সুকান্ত এই কবিতাটি লেখেন।

২৪। ১৯৪৫ সালে সুকান্ত মেজবৌদি রেণু দেবীর সঙ্গে কাশী বেড়াতে যান। সুকান্ত ফিরে এসে শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে এই চিঠিটি তাঁকে লিখেছিলেন। চিঠিটি রাখাল ভট্টাচার্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন।

২৫। 'মার্শাল তিতোর প্রতি' কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৪।

২৬। 'ব্যর্থতা' কবিতাটি আষাঢ় ১৩৫৩-এর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি 'মীমাংসা' কবিতার প্রথম খসড়া বলে মনে হয়।

২৭। ১৯৪৭ সালে রচিত এই কবিতাটি খুলনার 'সপ্তর্ষি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শয্যাশায়ী সুকান্ত 'রেড-এড কিওর হোম' হাসপাতালের রাইটিং প্যাডে এটি লিখে গাঠান। কবিতাটি শ্রীমনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

□